

প্রশান্তের আশ্রয়-দ্বীপ

হেমেন্দ্রকুমার রায়



প্রশান্তের আত্মপ্রদীপ

০১.

বিমল ও কুমার তো তোমাদের অনেকদিনের বন্ধু, কিন্তু তোমরা বোধহয় এটা জানো না, তারা দুজনেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এক তিথিতে এবং একই দিনে।

আজ মাসের পয়লা। এই মাসের আটশ তারিখে তাদের দুজনের জন্মতিথি। তাদের প্রত্যেক জন্মতিথিতেই বিশেষ একটি অনুষ্ঠান হয়। এবারকার উৎসবে কি করা কর্তব্য, সেদিন সকালের চায়ের আসরে বসে গভীরভাবে চলছিল তারই আলোচনা।

জয়ন্ত এবং মানিক বোধহয় তোমাদের কাছে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে তারা বিমলদের সঙ্গে দেখা করতে আসত, সেদিনও এসেছিল। আর সুন্দরবাবুর কথা তো বলাই বাহুল্য! কারণ, এখানকার প্রভাতী চায়ের বৈঠকে কোনওদিনই তাকে অনুপস্থিত দেখা যায় না। সুতরাং বলতে হবে আজকের চায়ের আসরটি জমে উঠেছিল রীতিমতো।

এমনকী বাঘা কুকুরও হাজিরা দিতে ভোলেনি। সেও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে দুই কান তুলে ঊর্ধ্বমুখে অত্যন্ত উৎসুক ভাবে তাকিয়ে ছিল চায়ের টেবিলের দিকে। সে বেশ জানে, টেবিলের ওপর থেকে এটা-ওটা-সেটা কিছু কিছু অংশ তারও দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।

মাঝে-মাঝে রামহরি খাবারের ট্রে হাতে করে ঘরের ভিতরে ঢুকে সকলকে পরিবেশন করে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরবাবু একখানা গোটা স্যান্ডউইচ নিজের মস্ত মুখবিবরে ছেড়ে দিয়ে চর্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, বিমল ভায়া, তোমাদের প্রতি জন্মতিথিতেই তো আমরা

এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে যাই; কিন্তু এবারকার খাদ্যতালিকার ভিতরে আমার একটি বিনীত প্রার্থনা ঠাই পাবে কি?

সুন্দরবাবুকে জ্বালাবার কোনও সুযোগই মানিক ত্যাগ করে না। সে বললে, আপনার বিনীত প্রার্থনাটি নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ? হয়তো বলে বসবেন, আমি কঁঠালের আমসত্ত্ব খাব।

সুন্দরবাবু স-টাক মাথা নেড়ে বললেন, না কখখনো নয়, অমন অসম্ভব আবদার আমি করব না। ফাজিল ছোকরা কোথাকার, আমায় কি কচি খোকা পেয়েছ?

কুমার হাসতে হাসতে বললে, আমাদের জন্মদিন আসতে না আসতেই চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ ভোলা কেন? মানিকবাবু, আপনি সুন্দরবাবুকে আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, ওঁর যা বলবার আছে উনি বলুন।

সুন্দরবাবু মানিকের দুষ্টুমিভরা হাসির দিকে একবার সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে বললেন, আমার কথাটা কি জানেন কুমারবাবু? এবারে আপনাদের জন্মতিথির খাদ্যতালিকায় কিঞ্চিৎ নতুনত্ব সৃষ্টি করলে কেমন হয়?

কীরকম নতুনত্ব সুন্দরবাবু!

দেখুন কুমারবাবু, চিরদিনই শুনে আসছি বনমুরগির মাংস নাকি একটি উপাদেয় খাদ্য; কিন্তু এমনই আমার দুর্ভাগ্য যে, আজ পর্যন্ত আমার খাবারের থালায় বন-মুরগির আবির্ভাব হল না কখনও। আপনাদের জন্মতিথির দৌলতে যদি সেই সৌভাগ্যটা লাভ করতে পারি, তা হলে আমার একটি অনেক দিনের বাসনা চরিতার্থ হয়।

মানিক বললে, দেখছ তো জয়ন্ত, সুন্দরবাবুর আবদারটি কতদূর অসংগত!

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বললেন, কেন, অসংগত কেন? আমি কি কঁঠালের আমসত্ত্ব খেতে চাইছি? বনমুরগি কি দুনিয়ায় পাওয়া যায় না?

মানিক বললে, দুনিয়ায় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু কলকাতা শহরে পাওয়া যায় না। আপনার বনমুরগির জন্যে বিমলবাবুরা বনবাস করবেন নাকি?

জয়ন্ত বললে, অভাবে কলকাতার ফাউল হলে কি চলবে না? সুন্দরবাবু কি বলেন?

সুন্দরবাবু বললেন, আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই। আরজি পেশ করলুম এখন। বিমলবাবুদের যা মর্জি হয়।

কুমার চো করে শেষ চা-টুকু পান করে উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, তথাস্তু, সুন্দরবাবু, তথাস্তু! আমাদের আসছে জন্মবারে আপনাকে বনমুরগির মাংস খাওয়াবই, খাওয়াব।

বিমল একটু বিস্মিত স্বরে বললে, কুমার, তুমি যে একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলে হে! কলকাতার কোনও বাজারে বনমুরগি বিক্রি হয় নাকি?

কুমার বললে, মোটেই না!

তবে?

আমার বন্ধু বিনোদলাল রায়চৌধুরী হচ্ছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার। তিনি প্রায়ই আমাকে ওখানে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। তুমি জানো বোধহয় চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনে ঝাঁকে আঁকে বনমুরগি পাওয়া যায়। মনে করছি, কালই আমি দিনকয়েকের জন্য চট্টগ্রাম যাত্রা করব।

মানিক বললে, সে কি কুমারবাবু, সুন্দরবাবুর একটা আবদার রক্ষা করবার জন্যে আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার করবেন?

না মানিকবাবু, কেবল সুন্দরবাবু কেন, আমি আপনাদের সকলেরই তৃপ্তি সাধনের জন্যে চট্টগ্রামে যেতে চাই। জন্মতিথিতে বন্ধুদের যদি একটি নতুন জিনিস খাওয়াতে না পারি, তা হলে জন্মতিথির আর সার্থকতা রইল কোথায়? আমি কালই চট্টগ্রামের দিকে ধাবমান

হব। তারপর সেখানকার বন থেকে ডজনখানেক জাত বনমুরগি সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসব আমাদের কলকাতার।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনার বিনীত প্রার্থনা তা হলে পূর্ণ হল। এইবারে আপনি পরমানন্দে অট্টোহায্য করতে পারেন।

সুন্দরবাবু অত্যন্ত খাপপা হয়ে কেবল বললেন, হুম।

চট্টগ্রাম থেকে কুমারের ফেরবার কথা ছিল বিশ তারিখে।

কিন্তু ঠিক তার আগের দিনে কুমারের কাছ থেকে বিমল এই টেলিগ্রাম পেলে, বনমুরগি পেয়েছি; কিন্তু আসছে কাল কলকাতার পৌঁছোতে পারব না। বিশেষ কারণে আমাকে আরও দিনকয়েক এখানে থেকে যেতে হবে। এজন্যে যদি আমাদের জন্মতিথি-উৎসব মাটি হয়, উপায় নেই।

টেলিগ্রামখানি হাতে করে বিমল বিস্মিত মনে ভাবতে লাগল, কুমারের বিশেষ কারণটা কী হতে পারে? নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ কারণ নয় যার জন্যে বনমুরগি পেয়েও সে যথাসময়ে এখানে আসতে নারাজ।

তেইশ তারিখে কুমারের আর একখানা টেলিগ্রাম এল। সেখানি পড়ে বিমল জানতে পারলে, চব্বিশ তারিখের সকালে সে কলকাতা এসে পৌঁছোবে।

কুমার একটি রীতিমতো রহস্যপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তুলেছিল। সেই জন্য বৈঠকখানায় তার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল বিমল, জয়ন্ত ও মানিক।

খানিক পরে রাস্তায় দরজার কাছে একখানা গাড়ি আসবার শব্দ হল। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে কুমার। জয়ন্ত বললে, কুমারবাবু, আপনার টেলিগ্রামে যা দেখেছি, আপনার মুখেও দেখছি তাই।

আমার মুখে কি দেখছেন জয়ন্তবাবু?

রহস্যের আভাস।

হাতের বন্দুকটা একটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে কুমার বললে, হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আপনি ভুল দেখেননি। যা-তা রহস্য নয়-যাকে বলে একেবারে গভীর রহস্য; কিন্তু সেকথা পরে বলছি, আগে বনমুরগিগুলোর একটা ব্যবস্থা করি।...রামহরি, ও রামহরি!

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, কি বলছ গো কুমারবাবু?

গাড়ির চালে এক ঝাঁক জ্যান্ত রামপাখি আছে। তুমি সেগুলোকে বাগানে মুরগি-ঘরে রেখে এসো। তারপর তাড়াতাড়ি আমার জন্যে খুব গরম এক পেয়ালা চা বানিয়ে দাও।

কুমার নিজের কোটটা খুলে একখানা সোফার ওপরে নিক্ষেপ করলে। তারপর নিজেও সেখানে বসে পড়ে বলল, বিমল, অদ্ভুত ব্যাপার-একেবারে অভাবিত!

বিমল বললে, তোমার মুখ থেকে শুনছি বলেই ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে বিশ্বাস করছি। পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকই যেসব ব্যাপারকে অদ্ভুত বলে মনে করে, তার মধ্যে। আমি কিছু মাত্র অদ্ভুতত্ব খুঁজে পাই না। কিন্তু তোমার-আমার কথা স্বতন্ত্র। এই জীবনেই আমরা এমন সব অসাধারণ ব্যাপার দেখেছি যে, আমাদের কাছে বোধহয় অদ্ভুত বলে আর কিছুই থাকতে পারে না। কাজেই তুমি যা অদ্ভুত আর অভাবিত বলে বর্ণনা করবে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে দস্তুরমতো অসাধারণত্ব আছে। আমরা প্রস্তুত, আরম্ভ করো তোমার অদ্ভুত কাহিনি।

বিমল সোফার ওপর একটু সোজা হয়ে বসল। গল্প শুনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিক্ষা করতে লাগল।

বিশাল হলঘর একেবারে নিস্তব্ধ!

.

০২. জন্তু না মানুষ

কুমার শুরু করলে কেমন করে আমি জ্যান্ত বনমুরগি সংগ্রহ করলুম সে কথা শোনবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমাদের আগ্রহ নেই। সুতরাং এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, চট্টগ্রাম বিভাগে একটা পাহাড় অঞ্চলের বনের ভিতরে গিয়ে এই পক্ষীগুলোকে আমি বন্দি করেছি। অবশ্য এই কাজে আমার জমিদার বন্ধু বিনোদলাল আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

ফেরবার সময় সমুদ্রের ধার দিয়ে আসছিলাম। সমুদ্র থেকে মাইল দশেক তফাতে চাকারিয়া নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে বিনোদের কয়েক ঘর প্রজা ছিল। তাদের কয়েকজন বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে এল। লক্ষ করে দেখলুম, তাদের প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন। তারা জানালে, একটা নর খাদক জন্তু এসে তাদের ওপরে ভীষণ অত্যাচার করছে। ইতিমধ্যেই অনেকের গরু ও ছাগল তো অদৃশ্য হয়েছেই, তার ওপরে জন পাঁচেক মানুষকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, জন্তুটা কি? বাঘ, না অন্য কোনও জানোয়ার?

উত্তরে জানা গেল, জানোয়ারটাকে কেউই স্বচক্ষে দেখেনি। গফুর আলির বাড়ি থেকে জানোয়ারটা যেদিন একটা বাছুর নিয়ে যায়, সে রাত্রে বৃষ্টি পড়ে পথঘাট হয়েছিল কর্দমাক্ত। সকালবেলায় খোঁজাখুঁজির পর বাছুরের আধ-খাওয়া দেহটা পাওয়া যায় মাঠের একটা ঝোপের ভিতরে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই, সেখানে কাদার ওপরে কোনও

জন্তুরই পায়ে দাগ পাওয়া যায়নি। কেবল এটা বেশ বোঝা গিয়েছে যে, রাত্রে একজন মানুষ ওই ঝোপের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে এসেছিল। কাদার ওপরে স্পষ্ট ভাবেই দেখা গিয়েছিল একটা মানুষের পদচিহ্ন।

এইখানেই জেগে উঠল আমার আগ্রহ। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা কি বলতে চাও, মানুষ ছাড়া কোনও জন্তুরই মাটির ওপরে পদচিহ্ন ফেলে সেই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করেনি?

একজন বললে, প্রবেশ করেনি একথা কেমন করে বলব! ঝোপের ভিতরে বাছুরটার আধখাওয়া দেহ যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে, এ কাজ কোনও মানুষের নয়। মানুষ কখনও গরু-বাছুরের কাঁচা মাংস খেতে পারে না। বাছুরটা যে কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছিল, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই জন্তুটা যে কেমন করে ঝোপের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে, কাদার ওপরে তার কোনও চিহ্নই আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি।

বিনোদ বললে, তাহলে কি তোমরা বলতে চাও জন্তুটা আকাশপথ দিয়ে আনাগোনা করেছে? তোমাদের কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

লোকটি বললে, হুজুর আমাদের কথায় বিশ্বাস না করলে আমরা মারা পড়ব। এ অঞ্চলে রোজ রাত্রেই, হয় মানুষ নয় গরু-ছাগল অদৃশ্য হচ্ছে। চারিদিকে এমন বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে যে, সন্ধ্যার পরে পথে-ঘাটে কেউ পা বাড়াতে ভরসা করে না। এমনকী রাত্রেও আমরা ভয়ে ঘুমুতে পারি না। হুজুর হচ্ছেন জমিদার, আপনি আমাদের রক্ষা না করলে আমরা কোথায় দাঁড়াব বলুন?

বিনোদ বললে, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

হুজুর, আপনাদের দুজনেরই কাছে বন্দুক রয়েছে। আপনারা ইচ্ছে করলেই জন্তুটাকে বধ করতে পারেন।

বিনোদ বললে, তোমরা বাজে কথা বলছ। তোমরাও জন্তুটাকে দেখতে পাওনি, আবার বলছ মাটির ওপরে পায়ের দাগ ফেলে সে চলাফেরা করে না। ঝোপের কাছে পেয়েছ মানুষের কতকগুলো পদচিহ্ন। মানুষ গরু-বাছুরের কাঁচা মাংস খায় না, এ কথা সত্য; কিন্তু কোনও মানুষ রাত্রে সেই ঝোপের ভিতরে যাবেই বা কেন? তোমাদের কোনও কথারই মানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

লোকটি কাঁদো কাঁদো মুখে আবার বললে, হুজুর, রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন।

বিনোদ অধীর স্বরে বললে, আরে, আমরা তোমাদের কেমন করে রক্ষা করব? তোমাদের জন্যে কি আমরা বন্দুক ঘাড়ে করে রাত্রে হাটে-মাঠে-ঘাটে পাহারা দিয়ে বেড়াব?

বিমল, আগেই বলেছি ততক্ষণে আমার কৌতূহল রীতিমতো জেগে উঠেছে। ঘটনার মধ্যে আমি পেলুম যেন রহস্যের গন্ধ। আমি বললুম, বিনোদ আমরা ইচ্ছে করলে হয়তো এদের কিছু সাহায্য করতে পারি।

কীরকম? তুমি তো কালকেই কলকাতার দিকে রওনা হতে চাও।

তুমি যদি রাজি হও, তাহলে আমি আরও তিন-চার দিন এখানে থেকে যেতে পারি।

বিনোদ হেসে ফেলে বললে, বুঝেছি। চডুকে পিঠ সড়সড় করে আর ধুনোর গন্ধ পেলেই মনসা নাচেন। বেশ, যা ভালো বোঝো করো।

বিমল, তার পরেই তোমার কাছে আসে আমার প্রথম টেলিগ্রাম।

লোকে যেমন করে বাঘ শিকার করে, আমিও অবলম্বন করলুম সেই পদ্ধতি।

পরদিনেই খবর এল, কুতুবদিয়া প্রণালী সৃষ্টি করে পৃথিবীর একটা বাহু যেখানে বঙ্গোপসাগরের ভিতরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, সেই নরখাদক জন্তুটার শেষ আবির্ভাব

হয়েছে। সেখানেই। ঝোপের ভিতরে সেখানেও পাওয়া গিয়েছে একটা গরুর খানিকটা খাওয়া দেহ।

হিংস্র জন্তুদের স্বভাবই হচ্ছে, উদর পূর্ণ হবার পর কোনও দেহের খানিকটা বাকি থাকলে তারা সেটা ঝোপ-ঝাপের ভিতরে লুকিয়ে রেখে যায়। পরদিন রাত্রে আবার তারা ফিরে এসে দেহের বাকি অংশটাকে গ্রহণ করে।

আমরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখলুম, যে ঝোপের ভিতরে গরুর দেহটা আছে, তার খুব কাছেই রয়েছে একটা মস্তবড় গাছ। লোকজনের সাহায্যে সেই গাছের ওপরে বাঁধলুম একটা মাচা। তারপর সন্ধ্যার আগেই বিনোদকে নিয়ে আমি সেই গাছে উঠে মাচার ওপরে গিয়ে বসলুম।

রাত্রে প্রথম দিকে আকাশে ছিল অষ্টমীর চাঁদ। আলো খুব স্পষ্ট না হলেও চারিদিকে বেশ নজর চলছিল। যে ঝোপটার দিকে আমাদের লক্ষ্য, তার দুই পাশেই ছিল খানিকটা করে খোলা জমি। তারপর দুই দিকেই দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের প্রাচীর। ওই ঝোপটার ভিতরে ঢুকতে হলে ভোলা। জমিটা পার না হলে আর উপায় নেই। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

তারপর চাঁদ গেল অস্তে। চারিদিকে অন্ধকার, আমাদের চোখও অন্ধ। বিনোদ একে রাত জাগতে অভ্যস্ত নয়, তার ওপরে এই অন্ধকারের জন্যে বিরক্ত হয়ে সে আরম্ভ করলে নিদ্রাদেবীর আরাধনা। আমি কিন্তু ঠায় জেগেই বসে রইলুম। কোনও দিকে চোখ চলছিল না। বটে, কিন্তু আমার দুই কান হয়ে রইল অত্যন্ত সজাগ। সে রাত্রে বাতাস পর্যন্ত ছিল না, বনের গাছপালা একেবারে নীরব; কিন্তু এই স্তব্ধতাকে ভাঙতে পারে এমন কোনও শব্দই আমার কানে প্রবেশ করলে না।

পূর্ব আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আলোর প্রথম আভাসটুকু। দু-একটা পাখিও ডাকতে আরম্ভ করলে।

আমার রাত জাগা ব্যর্থ হল ভেবে বিনোদকে জাগিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করছি, এমনসময় সচকিতে দেখলুম হঠাৎ এক দৃশ্য!

ডান দিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে জানোয়ারের মতো দেখতে কি একটা বেরিয়ে এল। অত্যন্ত ঝাপসা আলোতে জানোয়ারটা যে কি, তা বুঝতে পারলুম না; কিন্তু সে যে চার পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে এটুকু আমি লক্ষ্য করলুম। চলতে-চলতে একবার সে সন্দিগ্ধ ভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ যেমন জ্বলে, তারও দুই চক্ষে রয়েছে তেমনি জ্বলন্ত নীলাভ আলো।

নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখতে পায়নি, কারণ আবার সে অগ্রসর হল সেই ঝোপটার দিকে যার ভিতরে ছিল গরুটার অর্ধভুক্ত দেহ।

আমি বুঝলুম এই আমার সুযোগ। বন্দুক তুলে তখনই ঘোড়া টিপে দিলুম।

বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম একটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত চিৎকার! যাকে মনে করছিলুম হিংস্র জন্তু, হঠাৎ সে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিষম যন্ত্রণায় ইংরেজি ভাষায় আর্তনাদ করে উঠল, Oh my God! My God!

দ্বিতীয়বার বন্দুক ছোড়বার জন্যে আমার হাতের আঙুল তখন আবার ঘোড়ার ওপরে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মনুষ্য-কণ্ঠের সেই আর্তনাদ শুনে আমি এমন হতভম্ব হয়ে গেলুম যে, আর বন্দুক ছুঁতে পারলুম না।

মানুষই হোক আর জানোয়ারই হোক, সেই জীবটা আবার মাটির ওপরে পড়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতোই বেগে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যে।

ইতিমধ্যে কানের কাছে বন্দুকের শব্দ শুনেই বিনোদলালের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তার ওপরে আবার মানুষের আর্তনাদে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

প্রায় এক মিনিটকাল আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

তারপর বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি কুমার? বন্দুক ছুড়লে কেন? মানুষই বা আতঁনাদ করলে কেন? জানোয়ার ভেবে তুমি মানুষ খুন করলে নাকি?

আমি বললুম, আপাতত তোমার কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারব না। তবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো একটা কিছু দেখেছিলুম নিশ্চয়ই, নইলে খামোকা বন্দুক ছুঁড়তে যাব কেন? কিন্তু বন্দুক ছোড়বার ঠিক পরেই একটা মানুষের আতঁনাদের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিটা দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; তারপর সে পালিয়ে গেল আবার চতুষ্পদ জন্তুর মতোই চার পায়ে ভর দিয়ে।

বিনোদলাল আমার কথা বিশ্বাস করলে না। মাথা নেড়ে বললে, তুমি নিশ্চয় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখে রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছ! চতুষ্পদ জানোয়ার কখনও মানুষের ভাষায় চিৎকার করে না। আর মানুষও কখনও চতুষ্পদ জন্তুর মতো চার পায়ে ভর দিয়ে ছুটে পালায় না।

আমি বললুম, বেশ, তাহলে গাছ থেকে নেমে পড়ো। যে জীবটাকে দেখেছি, নিশ্চয় সে আমার গুলিতে জখম হয়েছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে তাকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না।

সমস্ত বনভূমি তখন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জ্যোতির্ময়ী উষার শান্ত আশীর্বাদে। আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাখির প্রভাতী সংগীতে। মাথার ওপরে আকাশ-পথ দিয়ে আঁকে আঁকে উড়ে যাচ্ছে বালিহাঁস, বনমুরগি এবং অন্যান্য পাখি। চোখের সামনে নেই আর অন্ধকার বা আবছায়ার বাধা।

মাটিতে নেমে আমরা দুজনে বন্দুক প্রস্তুত রেখে অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের যেখানে গিয়ে জীবটা অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, মাটির ওপরে রয়েছে টাটকা রক্তের দাগ। সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা এগিয়ে চললুম।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগুবার পর আমরা গিয়ে পড়লুম ফরসা জায়গায়। সেই খোলা জমির ওপরে গাছপালা নেই, মাঝে-মাঝে আছে কেবল ঝোপঝাঁপ বা ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। তারপর দেখা যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের সীমাহারা নীল জলের বিস্তার। রক্তের চিহ্ন চলে গিয়েছে সমুদ্রের দিকে।

বিনোদলাল বললে, কুমার তুমি যে জীবটাকে আহত করেছ, নিশ্চই সেটা জানোয়ার নয়। এখানে রক্তের দাগের সঙ্গে যে পায়ের চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো মানুষের পায়ের ছাপ না হয়ে যায় না।

বিনোদলাল ভুল বলেনি। সত্যি, এগুলো মানুষের পায়ের দাগই বটে।

বিনোদের কথার কোনও জবাব না দিয়ে পদচিহ্নের অনুসরণ করে আমি দৌড়োতে আরম্ভ করলুম। খানিকটা অগ্রসর হবার পরেই হঠাৎ দেখতে পেলুম, একখানা নৌকো তট ছেড়ে সমুদ্রের ভেতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এবং সেখানে চালনা করছে একটিমাত্র মানুষ।

আচম্বিতে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এল একটা বিশী অউহাসি। তোমরা শুনলে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সেই অদ্ভুত অউহাসির মধ্যে আমি পেলুম যেন একসঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং ব্যাঘ্রের হুঙ্কার।

খালি চোখে নৌকাবাহী মূর্তিটাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমার সঙ্গে ছিল দূরবিন, তাড়াতাড়ি সেটা বার করে চোখের সামনে ধরলুম।

যা দেখলুম তা কেবল আশ্চর্য নয়, উদ্ভটও বটে! নৌকোর ভেতরে বসে আছে একটা সম্পূর্ণ নগ্ন মনুষ্য মূর্তি। কিন্তু তার গায়ের রং অনেকটা চিতাবাঘের মতো! হলদের ওপর গোল গোল কালো ছাপ। কোনও কথা না বলে দূরবিনটা বিনোদলালের হাতে দিলুম। সেও মূর্তিটাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর দূরবিন নামিয়ে আমার দিকে ফিরে বললে, কুমার, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? ও লোকটা বোধহয় নিজের দেহের ওপরে তুলি বুলিয়ে চিতাবাঘের রং ফলিয়েছে।

কিন্তু কেন?

কেন আর, ও লোকটা বোধহয় ছদ্মবেশে এখানকার সকলকে ভয় দেখাতে চায়!

তা হলে তুমি ওকে মানুষ বলে মনে করো?

নিশ্চয়ই! রং ছাড়া ওর দেহের সমস্তটাই প্রমাণ দিচ্ছে যে ও হচ্ছে মানুষ! আর মানুষ ছাড়া অন্য কোনও জীবকে কখনও তুমি কি নৌকো চালাতে দেখেছ?

কিন্তু তুমি কি একথাও কখনও শুনেছ যে, মানুষ কখনও নরখাদক বাঘের মতো কাঁচা মাংস খাবার জন্যে গো-হত্যা আর নরহত্যা করেছে? ও মূর্তিটা আবার ইংরেজি ভাষায় কথা কয়। অথচ ও যেভাবে অউহাসি হাসলে, তার ভেতরেও পাওয়া গেল হিংস্র বাঘের গর্জন। কোনও মানুষ ওরকম গর্জন করতে পারে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আসলে কথা কি জানো বিনোদলাল? এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা! নইলে স্বচক্ষে যা দেখছি, স্বকর্ণে যা শুনছি, তাও সত্য বলে ভাবতে পারছি না কেন?

বিমল, এই হচ্ছে আমার কাহিনি। এই সঙ্গে এটুকু আমি বলে রাখি, এই ঘটনার পরে আরও দুদিন আমি চট্টগ্রামে ছিলাম। কিন্তু ও অঞ্চলে আর কোনও নৈশ উপদ্রবের কথা আমরা শুনতে পাইনি।

.

০৩.

কুমারের কাহিনি শেষ হওয়ার পর সকলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিমলের কপালের চর্ম কুণ্ডিত হয়ে উঠল, তার মুখে ফুটল গভীর চিন্তার লক্ষণ।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত। সে ধীরে ধীরে বললে, নেকড়ে বাঘ আর ভালুকেরা যে মাঝে-মাঝে মানুষের শিশু ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা না করে পালন করে, এর কয়েকটি

বিশ্বাসযোগ্য নজির আছে। কুমারবাবু যে কাহিনি শোনালেন, তাও কি সেইরকম কোনও ব্যাপার হতে পারে না? হয়তো কোনও মানুষ শিশু বয়স থেকে চিতাবাঘিনীর বাসায় পালিত হয়েছিল। তাই সেও পেয়েছে বাঘের স্বভাব, জীব-জন্তুর কাঁচা মাংস না হলে তার চলে না।

বিমল বললে, চিতা আর ভাল্লুকের বাসায় পালিত মানুষের কাহিনি যে সত্যি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওই শ্রেণির মানুষের স্বভাব জন্তুর মতো হয় বটে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা জানা গিয়েছে। প্রথমত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, তারা পনেরো-বিশ বছরের বেশি বাঁচে না। অনেকে তারও আগে মারা যায়। দ্বিতীয়ত জঙ্গল থেকে মানুষের আশ্রয়ে এসেও তারা মানুষের ভাষায় দু-চারটের বেশি কথা কইতে শেখে না; তৃতীয়ত, নেকড়ে বা ভাল্লুকের দ্বারা পালিত মানুষের গায়ের রং নেকড়ে বা ভাল্লুকের মতো হয় না; কিন্তু কুমারের কাহিনিতে আমার যে মানুষটির কথা শুনলুম, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আহত বলে সে পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায় আত্ননাদ করে। এই ভাষা সে কোথায় কার কাছে শিখলে? ভারতবর্ষের কোথাও চিতাবাঘের দ্বারা পালিত মানুষ সাহেবের আশ্রয়ে এসে ইংরেজি ভাষা শিখলে, সে কথা আজ দেশে দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠত। কিন্তু এমন কোনও চিতা-মানুষের কাহিনি কোনও দিনই আমাদের কানে ওঠেনি।

তারপর কুমার বলছে, তার গায়ের রং নাকি চিতাবাঘের মতো। চিতার বাসায় পালিত হলেও সে হচ্ছে মানুষ। সুতরাং প্রকৃতি বন্য হলেও তার গায়ের রং কখনও চিতার মতো হতে পারে না। তার ওপরে সে নাকি শিকার করে মানুষ ও জন্তুর কাঁচা মাংস খায়। জন্তুর দ্বারা পালিত যে মানুষ শিশু লোকালয়ে ফিরে এসেছে, তাদেরও এরকম স্বভাবের কথা শোনা যায়নি। যদি তর্কের অনুরোধে ধরে নেওয়া যায় যে, এই চিতা-মানুষটা বরাবর বনে থেকে নরখাদক বাঘের মতোই হিংস্র হয়ে উঠেছে, তাহলেও এখানে প্রশ্ন উঠবে, তবে সে ইংরেজি ভাষা শিখলে কার কাছ থেকে? আর লোকালয়ে না এসেও সে নৌকো চালনা করবার ক্ষমতা অর্জন করলে কেমন করে? না জয়ন্তবাবু, এই ঘটনার ভেতরে আছে গভীরতর রহস্য!

মানিক বললে, কিন্তু সে রহস্যের চাবিকাঠি যখন আমাদের কাছে নেই, তখন ওকথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপাতত কোনও লাভ হবে না। তার চেয়ে এখন উচিত হচ্ছে, কুমারবাবুর প্রসাদে সে বন্য রামপক্ষীগুলি আত্মদান করবার জন্যে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, সকলে মিলে তাদের পরিদর্শন করে আসা।

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, বেশ তো, চলুন না। আসুন জয়ন্তবাবু, এসো বিমল।

বিমল বললে, আপাতত মুরগি দেখবার ইচ্ছে আমার নেই। তোমরা যাও।

জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে কুমার ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরো পরে তারা যখন আবার ফিরে এল তখন দেখলে, বিমল একখানা বই হাতে নিয়ে চুপ করে বসে আছে।

মানিক সুধোল, ওখানা কি বই, বিমল?

বিমল বললে, এখানি এইচ. জি. ওয়েলসের বই। তুমিও পড়েছ, এর নাম হচ্ছে The Island of Dr. Moreau, মনে আছে, এই বইখানা নিয়ে আমরা দুজনে মিলেই অনেক জল্পনা কল্পনা করেছিলুম?

কুমারের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, বিমল! তুমি কি বলতে চাও? না, না, তা হচ্ছে অসম্ভব।

বিমল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, কি অসম্ভব, কুমার?

ডাক্তার মোরের দ্বীপের সঙ্গে নিশ্চয়ই চাটগাঁয়ের ওই আশ্চর্য মানুষটার কোনও সম্পর্ক নেই।

কেন?

প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ-আমেরিকার পাশে কোথায় সেই ডাক্তার মোরের আজব দ্বীপ, আর কোথায় এই ভারতবর্ষের চট্টগ্রাম। ও দ্বীপের কোনও জীব কেমন করে এখানে এসে হাজির হবে? এটা কি অসম্ভব নয়?

কুমার, তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমিও তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ওখান থেকে কোনও জীবের ভারতবর্ষে আসাটা কি ডাক্তার মোরের দ্বীপের চেয়েও বেশি অসম্ভব?

তুমি কি বলতে চাও, বিমল?

বিমল বললে, ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের কথা তোমার মনে আছে!

কুমার বললে, ফিলিপ? যার সঙ্গে আমরা দক্ষিণ-আমেরিকার ইকুয়াডর রাজ্যে সূর্যনগরীর গুপ্তধন দেখতে গিয়েছিলুম? নিশ্চয়ই। তাঁর কথা কি এত শিগগিরই ভুলতে পারি?

বিমল বললে, হ্যাঁ, আমি সেই ফিলিপ সাহেবের কথাই বলছি। এটাও তুমি ভোলোনি বোধহয়, মিস্টার ফিলিপ তার ভূ-পর্যটনের গল্প বলতে বলতে কত দেশের বিচিত্র সব রহস্যের কথা শুনিয়েছিলেন। তাঁরই মুখে ডাক্তার মোরের দ্বীপের কথা আমি প্রথম শুনি। প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক যেখানে সেই দ্বীপটি আছে, মি. ফিলিপ একখানা নকশা এঁকে তাও আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যদি একখানা জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্রপথে বেরিয়ে পড়ি, তাহলে সেই নকশা অনুসারে অনায়াসেই মোরের দ্বীপে গিয়ে হাজির হতে পারব।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু বিমলবাবু, কুমারবাবুর মুখে যে অদ্ভুত মানুষটার গল্প শুনে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, আমিও সেই মানুষটার সঙ্গে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও অদ্ভুত দ্বীপের কিছুমাত্র সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারছি না! আমারও প্রশ্ন হচ্ছে, একখানা ছোট বোট চড়ে অত দূর থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে কেউ কি ভারতবর্ষে এসে উঠতে পারে!

বিমল ধীরে-ধীরে বললে, জয়ন্তবাবু, মাঝে-মাঝে আপনি কি খবরের কাগজে পড়েননি যে, ছোট-ছোট তুচ্ছ নৌকায় চড়ে একাধিক সাহেব সমুদ্রপথে পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন? মাঝে মাঝে একথাও শোনা যায়, চীনা ও জাপানিরা ওইরকম ছোট নৌকায় চেপে অতবড় প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে ওই নৌকোর কথা না তুললেও চলে। কারণ, কুমারের দেখা ওই অদ্ভুত জীবটা যে নৌকোর চড়েই ভারতবর্ষে এসে পড়েছে, তারও কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। হয়তো সে অন্য কোনও উপায়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে, তারপর যেভাবেই হোক, একখানা নৌকো সংগ্রহ করেছে। সেই উপায়টা যে কি, তা নিয়ে আপাতত আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আর ওই জীবটা যে মোরোর দ্বীপেরই বাসিন্দা, তাও আমি জোর করে বলতে চাই না; কিন্তু কুমারের মুখে দ্বীপটার বর্ণনা শুনে আমার মনে প্রথমেই অনেক দিন পরে জেগে উঠেছে ডাক্তার মোরোর দ্বীপের কাহিনি। বহুকাল থেকেই আমার বাসনা ছিল আমরাও একবার ওই দ্বীপে গিয়ে দেখে আসব ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের আর এইচ জি ওয়েলসের কথা সত্যি কিনা! যদি আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি, তাহলে চট্টগ্রামের এই আজব জীবটার সঙ্গে কেন যে আমি ওই দ্বীপটার সম্পর্ক নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি সেকথা আপনাদের কাছে খুলে বলব।

মানিক বললে, বিমলবাবু, ডাক্তার মোরোর দ্বীপের রহস্য আমরা কোনওদিনই শুনিনি। আপনি দু-চার কথায় খুলে বলবেন কি?

এইচ জি ওয়েলসের বইখানা এগিয়ে দিয়ে বিমল বললে, আমার মুখে কিছুই শোনবার দরকার নেই। এই বইখানা নিয়ে যান, এর পাতাগুলির ওপরে চোখ বুলালেই সব কথা জানতে পারবেন; কিন্তু তার আগে বলুন দেখি, আমি আর কুমার যদি সেই দ্বীপের দিকে যাত্রা করি, তাহলে এই অ্যাডভেঞ্চারে আপনারাও কি যোগ দিতে রাজি হবেন?

জয়ন্ত ও মানিক সমস্বরে বলে উঠল, নিশ্চয়ই।

কুমার বললে, বিমলের অনুমান, ফিলিপ সাহেবের গল্প আর এইচ জি ওয়েলসের রচনা সত্য না হলেও আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না; জীবনে বড়ই ঘটনার অভাব হয়েছে, কলকাতা শহরকে মনে হচ্ছে ছোট খাঁচার মতো, এখানে আর বেশি দিন আবদ্ধ হয়ে থাকলে বেতো রুগির মতো শয্যাগত হয়ে পড়ব। অন্য কোনও ঘটনা ঘটুক বা নাই ঘটুক, অন্তত বঙ্গে পিসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছোটোছুটি করে আসা যাবে তো? আমার পক্ষে তাও হবে একটা বিপুল মুক্তির মতো!

বিমল বললে, কিন্তু সাবধান, রামহরি যেন আপাতত ঘুণাক্ষরেও মোরোর দ্বীপের কথা জানতে না পারে। তাহলে সে এখান থেকে কিছুতেই নড়তে রাজি হবে না। আমাদের রন্ধনশালার হর্তাকর্তা সে, তাকে সঙ্গে না রাখলে কি চলে? কি বলো, কুমার!

কুমার বললে, সে কথা আর বলতে? যখনই একলা বিদেশে গিয়েছি, রামহরির শ্রীহস্তের রান্না খেতে না পেয়ে রীতিমতো রোগা হয়ে পড়েছি।

বিমল হঠাৎ চাপা গলায় বললে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেই বুঝছি ঘরের ভেতরে এখনই সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হবে। দলে ভারী হওয়ার জন্যে তাকেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, তাকেও আসল রহস্যের কথা বলবার দরকার নেই।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন সুন্দরবাবু। কুমারের দিকে তাকিয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হুম! এই যে কুমারবাবু, আমার বনমুরগিদের খবর কি? নিশ্চয়ই তাদের চাটগাঁয়ে ফেলে আসেননি?

কুমার হাসতে হাসতে বললে, না, আপাতত তারা বাস করছে এই বাড়িতেই।

পেটের ওপরে ডান হাত বুলোতে বুলোতে এক গাল হেসে সুন্দরবাবু বললেন, চমৎকার! চমৎকার!

.

০৪.

সিন্ধুর মুখে বিন্দুর মতো অনেক দূরে দেখা গেল ছোট একটি দ্বীপ। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ থেকে আমরা জাহাজে উঠেছি, এবং জাহাজ এখন এসে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে এবং এখন যেখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তার একদিকে আছে ওই ছোট দ্বীপটি, আর একদিকে আছে দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি। এখানটা সাধারণ জাহাজ চলাচলের পথ নয়, আর সেই কারণেই ভাড়া করে একখানি নিজস্ব জাহাজ নিয়ে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।

ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া চার্টের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর আবার দ্বীপের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিমল উফুল্ল কণ্ঠে বললে, ওইটেই যে ডা. মোরোর দ্বীপ সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই! ওই ছোট জায়গাটুকুর ভেতরে কোনও বৃহৎ রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, দূর থেকে দ্বীপটিকে দেখলে মোটেই সে সন্দেহ হয় না!

হঠাৎ পেছন থেকে সুন্দরবাবুর কণ্ঠে শোনা গেল, হুম! আপনার এ কথার অর্থ কি বিমলবাবু!

বিমল তাড়াতাড়ি চার্টখানা মুড়ে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই যে সুন্দরবাবু! আপনি যে কখন চুপিচুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কিছুই টের পাইনি!

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, টের পাননি বলেই তো পেছন থেকে আমি আপনাদের সব কথা শুনতে পেয়েছি!

কি, শুনেছেন সুন্দরবাবু?

আরে, শুধু কি শুনেছি, আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝেছেন সুন্দরবাবু?

সাগর-ভ্রমণে বেরুবেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, এমনই সব আরও নানা লোভ দেখিয়ে আপনারা আমাকে কলকাতা থেকে এখানে টেনে এনেছেন। তারপর অকুল পাথারে ভেসে রোজ আপনাদের হাবভাব ব্যবহার দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, আপনাদের এই সাগরযাত্রার পেছনে কোনও গভীর রহস্য আছে। মাঝে-মাঝে সেই সন্দেহ আপনাদের কাছে প্রকাশও করেছিলুম; কিন্তু আমার কথা আপনারা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মশাই, গোয়েন্দাগিরি করে আমি চুল পাকিয়ে ফেললুম, আমার সন্দেহকে আপনারা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পারবেন কেন? তবে ফাঁদে যখন পা দিয়েছি, ফলভোগ করতেই হবে, কাজেই মুখে কিছু আর বলিনি; কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, কলকাতা থেকেই আপনাদের লক্ষ্য ছিল ওই অজানা দ্বীপটার উপরে।

মানিক মুখে কপট ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, বলেন কি সুন্দরবাবু! কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই ছোট দ্বীপটা। মাঝখানে আছে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার মাইল ব্যাপী জলপথ। আমাদের লক্ষ্য করবার শক্তি কি এতই অসাধারণ যে কলকাতার বসেই এই দ্বীপটা চোখে দেখতে পেয়েছি? না সুন্দরবাবু, না আপনার এই অত্যাচার অত্যাচার আমরা সহ্য করতে রাজি নই!

সুন্দরবাবু ত্রুদ্র কণ্ঠে বললেন, তোমার ঠাট্টা থামাও মানিক! অসময়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমার বিরুদ্ধে একটা মস্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে! নইলে তোমরা যে এই বিশেষ দ্বীপটাতেই আসতে চাও, একথা আগে আমাকে বলেনি কেন?

বললে কি করতেন?

করতুম আর কি, তোমাদের সঙ্গে আসতুম না।

কেন আসতেন না?

হুম! এর আগে, বোকার মতো তোমাদের পাল্লায় পড়ে যত বারই দেশের বাইরে এসেছি, ততবারই পড়েছি সাংঘাতিক সব বিপদে। তবু বেশির ভাগ বিপদের ধাক্কা কোনওরকমে।

সামলাতে পেরেছি ভারতবর্ষের মাটিতেই ছিলুম বলে। কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে এসে পড়েছি। এমন এক জায়গায় যেখানে মা-বাপ বলতে কেউ থাকবে না। চারদিকে কেবল থইথই করছে জল, তার মাঝখানে একরত্তি একটা সরষের মতো রয়েছে ওই বাজে দ্বীপটা! হায় রে, আর কি আমি দেশে ফিরতে পারব?

কুমার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললে, সুন্দরবাবু, একটা ছোট দ্বীপ দেখে এতটা ভড়কে যাচ্ছেন কেন?

সুন্দরবাবু আরও রেগে উঠে বললেন, ভড়কে যাব না কীরকম? বলেন কি মশাই? আপনাদের আমি কি চিনি না? আমি কি জানি না পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানে অপেক্ষা করে আছে মারাত্মক সব আপদ-বিপদ, একটু খবর পেলেই সেই সব জায়গায় আপনারা ছুটে যান বন্ধ পাগলের মতো! আপনারা যে ওই বিশেষ দ্বীপটাতে সুমুদুরের হাওয়া ভক্ষণ করতে আসেননি, এটুকু বুঝতে পারব না এমন কচি খোকা আমি নই। আপনাদের ধাপ্পায় ভোলবার কথা আমার নয়; কিন্তু কি জানেন কুমারবাবু, মুনিরও মতিভ্রম হয়, আমারও মতিভ্রম হয়েছিল। নইলে কি আপনাদের সঙ্গে আবার দেশের বাইরে পা বাড়াতুম? কখনও না!

এমনসময় রামহরি সেখানে দাঁড়াল। সকলকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, কী হয়েছে সুন্দরবাবু, আপনি এত খাপ্পা হয়ে উঠেছেন কেন?

সুন্দরবাবু, বললেন, খাপা না হয়ে উপায় কি রামহরি? এই বাবুগুলি ধাপ্পা দিয়ে আমাদের দুজনকে এখানে কেন টেনে এনেছেন জানো?

কেন সুন্দরবাবু?

আমরা জবাই হব বলে।

রামহরি দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, এরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এত দূর এসেছে কেন জানো? ওই একফোঁটা দ্বীপে গিয়ে নামবে বলে।

রামহরি ফিরে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে বললে, বাবুরা ওই দ্বীপে গিয়ে নামবে নাকি? ওটা কী দ্বীপ?

ভগবান জানেন! দ্বীপটার যা চেহারা দেখছি, পৃথিবীর কোনও মানুষই বোধহয় ওর নাম কখনও শোনেনি!

ওই দ্বীপে কি আছে?

ওখানে নিশ্চয়ই আছে মূর্তিমান বিভীষিকার দল। তা নইলে এমন ডাহা ডানপিটে ছোকরার দল এতদূর কখনও ছুটে আসে? দ্বীপটাকে দেখেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! ঘাড়ে ভূত না চাপলে অমন দ্বীপে কেউ বেড়াতে আসে না।

রামহরি সায় দিয়ে বললে, তা যা বলেছেন! এই বাবুগুলির প্রত্যেকেরই ঘাড়ে চেপে আছে একটা করে ভূত!

সুন্দরবাবু বললেন, কিন্তু আমাদের ঘাড়ে তো ভূত নেই, আমরা কেন এদের সঙ্গে বেঘোরে ছুটোছুটি করে মরি!

রামহরি দার্শনিকের মতো গম্ভীরভাবে বললে, সঙ্গদোষে সব হয় সুন্দরবাবু, সঙ্গদোষে সব হয়।

সুন্দরবাবু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখো রামহরি, এসে যখন পড়েইছি তখন উপায় নেই। কিন্তু আমার একটা কথা সর্বদাই মনে রেখো। জেনো, এই দলে মানুষের মতো মানুষ বলতে আছি কেবল আমরা দুজন। আমরা ওদের দলে কোনও দিনই যোগ দেব না। ভবিষ্যতে আমরা যা করব, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই করব, ওদের কারুর পরামর্শ আমরা শুনব না। চলো, চুপিচুপি তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলতে চাই।

বিমলের দিকে একবার উত্তপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রামহরির হাত ধরে প্রশ্ন করলেন সুন্দরবাবু।

জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছে। এখান থেকে দ্বীপের সবটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার আয়তন সাত-আট বর্গমাইলের বেশি হবে না। এ অঞ্চলে অধিকাংশ দ্বীপেরই উৎপত্তি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে। এই দ্বীপটির উৎপত্তির মূলেও সেই কারণই অনুমান করা যায়।

দ্বীপের একদিকে রয়েছে নতুনত মুক্তভূমি, বাকি সবখানেই দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ রঙের ছবি, লতা-গুল্ম পাতায় ঢাকা গাছের পরগাছের দল। সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে তালজাতীয় একরকম গাছ। একদিকে সমুদ্রের নীল জলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু ও সুদীর্ঘ কালো পাথুরে পাড়। তার ওপরে একটানা চলে গিয়েছে বড় বড় ঝোপের পর ঝোপ। সেখানকার নিবিড় শ্যামলতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল প্রভাত-সূর্যের সোনালি জলের ঢেউ।

বিমলের দৃষ্টি হঠাৎ চমকে উঠল। এক দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বললে, দেখুন জয়ন্তবাবু দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, ঝোপগুলোর তলায় সরাসরি বসে কতকগুলো নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু সেগুলো যে জীবন্ত মূর্তি, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্পষ্ট করে দেখা না গেলেও তাদের মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মূর্তির গায়ের ওপরই দেখা যাচ্ছে নানান-রকম রঙের খেলা হলদে, কালো, সাদা ও লালচে প্রভৃতি।

কুমার বললে, বিমল, ওরা যদি মানুষ হয় তাহলে ওদের গায়ের রং ওরকম কেন? ওরা কি গায়ের সঙ্গে মিলানো কোনও রঙিন পোশাক পরে আছে?

বিমল বললে, কিছুই তো বলতে পারছি না। ডা. মোরোর দ্বীপে যে ওরকম রঙিন পোশাক-পরা মানুষ আছে, এ খবর তো আমিও পাইনি।

জাহাজের সাইরেন হঠাৎ তীব্র স্বরে বেজে উঠে আকাশ-বাতাস চারদিক যেন বিদীর্ণ করে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে ঝোপগুলোর সুমুখ থেকে প্রত্যেক মূর্তিই এক এক লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

জয়ন্ত বললে, ওগুলো নিশ্চয়ই মানুষের মূর্তি নয়।

বিমল বললে, কেন?

মানুষ কখনও বসে বসেই অত উঁচু লাফ মেরে ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়তে পারে?

বিমল কোনও উত্তর দিলে না। কিন্তু সুন্দরবাবুর টনক নড়ল। দুই চক্ষু বিস্ময়িত করে তিনি মত প্রকাশ করলেন, ওগুলো মানুষ, নয়, হুম!

মানিক বললে, আপনি কি বলতে চান সুন্দরবাবু?

দুই ভুরু সংকুচিত করে সুন্দরবাবু বললেন, আমার কথার অর্থ হচ্ছে, তুমি একটি পাজির পা-ঝাড়া!...রামহরি! অ রামহরি! শুনেছ? যা ভেবেছি তাই, আমরা এসেছি একটা ভূতুড়ে দ্বীপে!

জাহাজ আর অগ্রসর হতে পারলে না। সেইখানেই নোঙর ফেললে। বিমলের আদেশে খালাসিরা দ্বীপে যাবার জন্যে বোট নামাবার আয়োজনে নিযুক্ত হল।

রামহরির কানে কানে সুন্দরবাবু বললেন, আমাদের দুজনের কি উচিত জানো রামহরি? ওই দ্বীপে না উঠে এই জাহাজের ভেতরেই বাস করা।

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, তা, হয় না বাবুমশাই! খোকাবাবু যমালয়ে যেতে চাইলে আমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হবে।

সুন্দরবাবু এমন একটা মুখভঙ্গি করলেন যার দ্বারা বোঝা গেল, রামহরির উত্তর শুনে তিনি মোটেই প্রীত হননি।

.

০৫.

একদিকে অরণ্য ও ছোট-ছোট পাহাড়ের শিখর, একদিকে একটি ছোট নদী এবং আর দুই দিকে পনেরো-ষোলো হাত প্রবালপ্রাচীর, তারই মাঝখানে ফেলা হয়েছে কয়েকটা তারু।

জয়ন্ত বললে, বিমলবাবু আপনি চমৎকার স্থান নির্বাচন করেছেন। ওই দুদিকে প্রবাল প্রাচীর আছে বলে শত্রু আসবার ভয় নেই। কেবল ওই বন আর নদীর দিকে সাবধানী দৃষ্টি রাখলেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব।

হঠাৎ সুন্দরবাবু একটা সুউচ্চ লম্ফ ত্যাগ করে উঠলেন, বাপ রে, ভূমিকম্প হচ্ছে।

বিমল সহজ স্বরেই বললে, ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই। এখানে পায়ের তলায় মাঝে-মাঝে মাটি এমনি কঁপবে!

সুন্দরবাবু ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন, বটে! এখানকার মাটির এমন বেয়াড়া স্বভাবের কারণটা কি শুনি?

এটা সাধারণ দ্বীপ নয়, এখানে সমুদ্রের তলায় যে আগ্নেয়-পর্বত আছে, এই দ্বীপটিকে তারই চূড়া বলে বর্ণনা করা যায়। আমি আর কুমার দ্বীপের খানিকটা পরিদর্শন করে এসেছি। চারিদিকেই দেখেছি পাথরের গায়ে রয়েছে গর্তের পর গর্ত। সেই সব গর্ত আর কিছুই নয়, আগ্নেয়-পর্বতের ধোঁয়া বেরুবার পথ। ওই দেখুন, খানিক দূরে একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পাচ্ছেন? ওখানেও গর্তের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগ্নেয় পর্বতেরই ধোঁয়া।

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, বিমলবাবু, আপনি যে আমার আক্কেল গুডুম করে দিলেন। পায়ের তলায় ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরি নিয়ে মানুষ কখনও বাস করতে পারে? কোনদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন, আর আমাদের দেহের বদলে এখানে পড়ে থাকবে খালি মুঠো কয়েক ছাই।

বিমল বললে, অতটা দুর্ভাবনার দরকার নেই। এইচ জি ওয়েলস সাহেবের গল্পের নায়ক এই দ্বীপে এসেছিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তারও দশ-পনেরো বছর আগে যে এই দ্বীপটার অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এত দিনের মধ্যেও আগ্নেয়গিরি যখন উৎপাত করেনি তখন আরও গোটাকয়েক দিন আমরা বোধহয় নিরাপদেই কাটিয়ে দিতে পারব।

বিমলদের সঙ্গে এসেছিল বারো জন গুর্খা। তারা সকলেই আগে ফৌজে কাজ করত। বিমল তাদের ডেকে হুকুম দিলে যে, যে দুদিকে প্রবালপ্রাচীর নেই সেইখানে সর্বদাই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিতে। তারপর ফিরে বললে, আমাদের সবাইকে এখানে সর্বদাই সশস্ত্র হয়ে থাকতে হবে। কারণ, কোনও দিক দিয়ে কখন শত্রুর আবির্ভাব হবে, কিছুই বলা যায় না। কুমার, আমাদের মেসিন-গান দুটো তুমি বাইরে এনে বসিয়ে রাখো।

এইসব আয়োজন দেখে সুন্দরবাবুর উদ্বেগ ও অশান্তি ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বিমল, কুমার, মানিক ও জয়ন্তর কাছ থেকে তিনি কোনও সান্ত্বনাই খুঁজে পেলেন না। তাদের কাছে গেলেই তিনি পান শুধু ভীষণ সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

শেষটা রীতিমতো মুষড়ে পড়ে তিনি ঢুকলেন গিয়ে রামহরির তাবুর ভেতরে। রামহরি রান্নায় ব্যস্ত ছিল। তার বন্ধনের বিচিত্র আয়োজন দেখে সুন্দরবাবুর অশান্ত মনটা অনেকটা প্রশান্ত হয়ে উঠল। আর একটি প্রাণীও সেই তাঁবু-রান্নাঘরের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সে হচ্ছে বাঘা। তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছে মাংসের সুগন্ধ।

সেই রাত্রে।

চন্দ্রহীন অন্ধকার রাত যেন কান পেতে শ্রবণ করছে বিশাল সাগরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-কোলাহল!

আচম্বিতে মানুষের আত্ননাদের পর আত্ননাদে চারিদিক হয়ে উঠল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত! সঙ্গে-সঙ্গে বারবার শোনা গেল রিভলভারের শব্দ! তার পরেই জাগল কুকুরের ত্রুদ্ব চিৎকার!

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক সকলেই ব্যস্তভাবে তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

কুমার উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে, এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বাঘাও চাঁচাচ্ছে। সুন্দরবাবু ক্রমাগত রিভলভার ছুড়ছেন! ব্যাপার কী?

সকলে দ্রুতপদে সুন্দরবাবুর তাঁর ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখলে, তার এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছেন সুন্দরবাবু। তাঁর মুখ-চোখ আতঙ্কগ্রস্ত।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে সুন্দরবাবু, আপনার এমন অবস্থা কেন?

প্রথমটা সুন্দরবাবু কোনও কথাই উচ্চারণ করতে পারলেন না। তারপর কেবলমাত্র বললেন, হনুমান-বিছে!

হনুমান-বিছে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, হনুমান-বিছেই বলো আর বিছে-হনুমানই বলো, আমি দেখেছি একটা অসম্ভব জীবকে।

মানিক বললে, জয়ন্ত, ভয়ে সুন্দরবাবুর মাথার কল বিগড়ে গেছে, যা বলছেন তার মানেই হয় না।

ভয়ার্ত সুন্দরবাবু এইবারে হলেন রীতিমতো ত্রুদ্ব। চেষ্টা করে উঠলেন, হ্যাঁ হে বাপু, আমার তো মাথার কল বিগড়ে গেছে, কিন্তু এখানে আজ থাকলে তোমার দেহের ওপরে।

মাথাটাই বজায় থাকত কিনা সন্দেহ। আমি যা দেখেছি, কেউ কোনও দিন দুঃস্বপ্নেও তা দেখেনি। বাস রে বাস, আমার বুকটা এখনও শিউরে শিউরে উঠছে। ভাগ্যে রিভলভারটা ছিল, নইলে আজ কী যে হত কিছুই বলা যায় না।

বিমল বললে, শান্ত হন সুন্দরবাবু। ভালো করে বুঝিয়ে বলুন আপনি কি দেখেছেন।

সুন্দরবাবু ধপাস করে বিছানার ওপরে বসে পড়ে আগে খুব খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিলেন। তারপর কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, সব কথাই বলব বটে, কিন্তু সকলের কাছে আগেই একটি অনুরোধ করে রাখছি। আমি স্বচক্ষে সত্যই যা দেখেছি তা ছাড়া আর কিছুই বলব না। আমি ভুলও দেখিনি, অত্যাচারও করব না। কিন্তু আপনারা দয়া করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন।

খাওয়াদাওয়ার পর সকলকার সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব করে নিজের তাঁবুতে এসে আমি তো শুয়ে পড়লুম। খানিক পরেই ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে এল চোখের পাতা। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই মনে হল তাঁবুর ভেতরে আমি আর একলা নেই। প্রথমেই নাকে এল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ। তার পরেই শুনলুম মাটির ওপরে খসখস করে শব্দ হচ্ছে।

আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে বসলুম। ঘুমোবার সময় আলো নিবিয়ে দিইনি, তাঁবুর এক কোণে জুলছিল হারিকেন লণ্ঠনটা। সেই আলোতে দেখলুম, বেশ একটা মোটা সাপের মতো জীব আমার খাটের তলায় গিয়ে ঢুকছে, বাইরে বেরিয়ে আছে কেবল তার ল্যাজের দিকটা। ভালো করে দেখে বুঝলুম সেটা সাপ নয়, তার গায়ের রং তেঁতুলে বিছের মতো, আর দেহের গড়নও প্রায় সেইরকমই।

লম্বায় তার দেহটা কতখানি তা বুঝতে পারলুম বটে, কিন্তু চওড়ায় তার দেহটা সাত আট ইঞ্চির কম হবে না। এত বড় বিছের কথা জীবনে কোনওদিন শুনিনি। এ যদি কামড়ায় তাহলে আমার অবস্থাটা হবে কীরকম, তা অনুমান করেই তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে নিলুম।

বিছেটা বোধহয় টের পেয়েছিল যে আমি জেগে উঠেছি। সাঁৎ করে তার দেহের সবটাই ঢুকে গেল খাটের তলায়। আমি মহা ফাঁপরে পড়ে বিছানার উবু হয়ে বসে ভীষণ ভয়ে ঘেমে উঠতে লাগলুম।

তারপর অত্যন্ত আচমকা একটা ভয়ানক উদ্ভট জীব খাটের তলা থেকে বাইরে এসে পড়ল। সেটাকে দেখে তো আমার চক্ষুস্থির!

বিমলবাবু, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, প্রায় ছয় ফুট লম্বা ও সাত-আট ইঞ্চি চওড়া বৃশ্চিকের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে একখানা মস্ত হনুমানের মুখ? কল্পনা তো করতে পারবেনই না, হয়তো আমার কথা বিশ্বাসও করবেন না; কিন্তু আমি কিছুমাত্র ভুল দেখিনি, বলেন তো ঈশ্বরের নামে শপথ করতে পারি।

গোখরো সাপেরা ফণা তুলে যেমন মাটির ওপর থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠে, এই কিন্তুতকিমাকার আশ্চর্য জীবটা ঠিক সেইভাবে উঁচু হয়ে আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে গর্জন করে উঠতেই আমি রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলুম। পরমুহূর্তেই জীবটা মাটির ওপরে আছাড় খেয়ে পড়ল আর তার ল্যাজের ঘা লেগে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা ভেঙে একেবারে নিভে গেল।

তাঁবুর ভেতর ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ আমার খাটের ওপরে সশব্দে কি একটা এসে পড়ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে উপর্যুপরি রিভলভার ছুঁড়তে লাগলুম। তারপর আপনাদের আবির্ভাব। এখন তো দেখছি সে আশ্চর্য জীবটা আর তাঁবুর ভেতরে নেই; কিন্তু বলুন আপনারা, যেটাকে এইমাত্র আমি দেখেছি, সেটা কি জীব হতে পারে? আপনারা হয়তো বলবেন, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে আমি জেগে উঠছি। কিন্তু স্বপ্ন নয় মশাই, স্বপ্ন নয়। আমার রিভলভারের গুলি খেয়ে জীবটা আহত হয়েছিল। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, এখনও তার রক্তের দাগ ওখানে রয়েছে।

জয়ন্ত হেঁট হয়ে রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, হা, সুন্দরবাবু, আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করছি। একটা কোনও জীব যে আপনার রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই; কিন্তু আপনি যেরকম বললেন, জীবটাকে কি ঠিক সেই রকমই দেখতে?

সুন্দরবাবু বললেন, একেবারে অবিকল! এখনও আমার চোখের সামনে তার মূর্তিটা যেন জ্বলজ্বল করছে। যতদিন বাঁচব তার চেহারা কোনওদিন ভুলব না, হুম!

কুমার বললে, জীবতত্ত্বে হনুমানের মতো মুখ আর বৃশ্চিকের মতো দেহধারী প্রাণীর কথা কোনওদিন পাওয়া যায়নি। কোনও জীবতত্ত্ববিদই এরকম উদ্ভট জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না।

সুন্দরবাবু বললেন, জীবতত্ত্বের পণ্ডিতরা আমার কথা শুনে কি বলবেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার বিশ্বাস, আজ যাকে দেখেছি, জীব রাজ্যের কেউ সে নয়। বলেছি তো এটা হবে ভূতুড়ে দ্বীপ, ভূতেরা কত রকম দেহ ধারণ করতে পারে তা কি কেউ জানে?

বিমল ধীরে ধীরে বললে, ডা. মোরোর দ্বীপে যে এরকম জীব পাওয়া যায়, এইচ জি ওয়েলস তার উল্লেখ করেননি; কিন্তু তাঁর কেতাবে এ সম্বন্ধে দু-একটা ইঙ্গিত আছে বটে।

জয়ন্ত বললে, কীরকম ইঙ্গিত?

পরে তা বলব। আপাতত আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, এই দ্বীপটা ভালো করে পরিদর্শন করা। এখানকার জঙ্গলের ভেতরে গেলে আর পাহাড়ের ওপরে উঠলে নিশ্চয়ই বহু রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কাল সকালেই আমরা এখানকার জঙ্গলের দিকে যাত্রা করব।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, আমরা মানে? আমি কোনওদিনই ওই জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ভূতের হাতে প্রাণ খোঁয়াতে রাজি নই। এখানকার একটিমাত্র জীবের যে নমুনা

দেখলুম আমার পক্ষে তা যথেষ্টরও বেশি। জঙ্গলের ভেতরে নানা রূপ ধারণ করে আরও যাঁরা বিরাজ করছেন, আমি দূর থেকেই তাদের পায়ে প্রণাম করছি।

.

০৬.

সকালবেলায় চায়ের আসরে বিমলের কাছে গিয়ে রামহরি মিনতি করে বললে, খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি। ও জঙ্গলের ভেতরে তোমাদের আর গিয়ে কাজ নেই।

বিমল মুখ টিপে হেসে বললে, ছিঃ রামহরি, তুমি যত বুড়ো হচ্ছে, ততই ভীৰু হয়ে উঠছ।

রামহরি বললে, হ্যাঁ খোকাবাবু, আমি ভয় পাচ্ছি বটে। কিন্তু তুমি কি জানো না আমার ভয় হয় কেবল তোমার জন্যেই? ওই জঙ্গলটার লক্ষণ ভালো নয়। ওদিকে তাকালেই আমার বুক চমকে উঠে, মনে হয় যত রাজ্যের যত বিপদ ওখানে যেন ওত পেতে বসে। আছে! তুমি কি লক্ষ্য করোনি খোকাবাবু, এখানে একটা পাখিরও গান শোনা যায় না?

বিমল বললে, এখানে চারদিকে কেবল জল আর জল! এই বিশাল সমুদ্র পার হয়ে কোনও গানের পাখিই এত দূর উড়ে আসতে পারে না। কিন্তু ওই পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখো। ওখানে বসে রয়েছে কত সামুদ্রিক পাখি! ওরা গান গায় না বটে, কিন্তু চিৎকার করে যথেষ্ট!

রামহরি বললে, যে সব পাখি গান গাইতে পারে না, তারা হচ্ছে অলক্ষুণে। যেমন পেঁচা আর বাদুড়। তাদের দেখলেই মনে ওঠে বিপদ-আপদের কথা। তা পাখি থাক আর না থাক, তুমি ওই জঙ্গলের ভেতরে যেও না।

বিমল মাথা নেড়ে বললে, তা হয় না রামহরি! আমরা যে রহস্যের খোঁজে এতদূর এসেছি, তাকে পাওয়া যাবে হয়তো ওই জঙ্গলের মধ্যেই। এ দ্বীপটা খুবই ছোট। ঘুরে আসতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। সুন্দরবাবুকে নিয়ে তুমি এখানেই থাকো, ফিরে এসে

তোমাদের হাতের রান্না খাব। ছজন-গুখা এখানে পাহারা রইল, বাকি ছজন যাবে আমাদের সঙ্গে। কীরে বাঘা, তুইও এখানে থাকবি, না আমাদের সঙ্গে যাবি?

কিন্তু বাঘা তাদের সঙ্গে যাবার জন্যেই প্রস্তুত। সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিমলের পায়ে কাছে ছুটে এসে বললে, ঘেউ, ঘেউ! তারপর বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক যখন পথে বেরিয়ে পড়ল তখন বাঘা ছুটে লাগল সকলের আগে আগেই।

ছোট্ট একটা নদী নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে, দুই তট কল-সংগীতে পূর্ণ করে। মাঝে মাঝে তার জলরেখা হারিয়ে গিয়েছে বড়-বড় ঝোপের তলায়। তারপর আরম্ভ হল চড়াই, লতাপাতা ও তৃণগুলো অলংকৃত ভূমি ক্রমেই উঠে গিয়েছে ওপর দিকে। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট শৈলখণ্ড, এক জায়গায় রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ, তার জল বেরিয়ে আসছে আগ্নেয়-পাহাড়ের তপ্ত বুকের ভেতর থেকে। চড়াই যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, দ্বীপের অনেকটা অংশ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে রিলিফ ম্যাপের মতো।

নদী, পাহাড়, উপত্যকা, মাঠ ও অরণ্য ও শ্যামলতার পরেই দেখা যাচ্ছে সীমাহীন মহাসাগরের নির্মল নীলিমা। এ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না, এখানে যে জীব-জন্তু বাস করে কোথাও এমন চিহ্নই নেই।

বিমল বললে, সূর্যের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে বটে, কিন্তু সামনের ওই অরণ্যটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সূর্যকরও ওর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, এই দ্বীপের বাসিন্দারা সূর্যকে ভয় করে। ওই অরণ্যের অন্ধকারের ভেতরে গেলে হয়তো আমরা তাদের আবিষ্কার করতে পারব। কিন্তু সাবধান, বন্দুককে প্রস্তুত রেখে আমাদের ওই বনের ভেতর গিয়ে ঢুকতে হবে।

চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সকলে আবার অগ্রসর হল ধীরে-ধীরে।

নীচের দিকে ছোট-বড় পাথর, ঝোপ-ঝাঁপ ও আগাছার জঙ্গল এবং মাথার ওপরে লতার ঘন জালে বাঁধা মস্ত মস্ত গাছের শ্যামল পত্রছত্র। বাতাসের হিল্লোলে শোনা যাচ্ছে অশ্রান্ত তরু-মর্মরের ভাষা। দেখতে-দেখতে দিনের আলো যেন ঝিমিয়ে পড়ল। বনের ভেতরে চারদিকে নেমে এল সন্ধ্যার আবছায়া। সেই আলো-আঁধারি মাখা অরণ্যের অন্তঃপুর তখন হয়ে উঠল রীতিমতো রহস্যময়।

তারা বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে পার্বত্য প্রদেশের অরণ্য। এখানে বনের এক-একটা অংশ হঠাৎ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। সেই রকম একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমল সচমকে বলে উঠল, চুপ!

নীচের দিক থেকে শোনা যাচ্ছে কাদের কণ্ঠস্বর। সেগুলো যে মানুষের কণ্ঠস্বর তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সেরকম স্বরে কথা কয় না। তারও চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার। এই অদ্ভুত দ্বীপের গভীর জঙ্গলে বসে কারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে ইংরেজি ভাষায়! যে কথাগুলো শোনা গেল, বাংলা ভাষায় তরজমা করলে তা দাঁড়ায় এইরকম। একজন বললে, চার পায়ে চলব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?

কয়েকটা কণ্ঠ সমস্বরে বললে, আমরা মানুষ!

প্রথম কণ্ঠ বললে, মাছ-মাংস খাবো না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?

উত্তরে সমস্বরে শোনা গেল, আমরা মানুষ।

আবার প্রথম কণ্ঠ বললে, মানুষদের দেখলে তাড়া করবে না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?

সমস্বরে শোনা গেল, আমরা মানুষ!

তারা ইংরেজি ভাষায় কথা কইছে বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিকতা এবং উচ্চারণে ছিল অদ্ভুত এক জড়তা। কৌতূহলী বিমল মাটির ওপরে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে পাহাড়ের ধারে গিয়ে নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে সাবধানে দেখতে লাগল। অন্য সকলেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

নীচের দিকে রয়েছে একটা খাদের মতো অপরিসর জায়গা; দুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় নিয়ে সংকীর্ণ একটা উপত্যকার মতো সেই খাদটা খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। এর থেকে ওধারের পাহাড় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ওপর দিকে রয়েছে এমন লতা-পাতার জাল যে, নীচের খাদের ভেতরে সূর্যরশ্মির একটা টুকরো পর্যন্ত প্রবেশ করছে না। ছায়ামাখা ময়লা আলোয় খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা মানুষের মূর্তি। খানিকক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল, সেগুলো মানুষের মূর্তি হলেও তাদের দেহগুলোকে অমানুষিক বললেও অন্যায্য হবে না। প্রত্যেক মূর্তিরই দেহের উপর-অংশ যেমন বড়, পায়ে দিক তার তুলনায় তেমনি ছোট। তাদের মধ্যে যে মূর্তিটা সবচেয়ে বৃহৎ, তাকে দেখলে বনমানুষ বা গরিলা ছাড়া আর কোনও জীবকেই মনে পড়ে না। অথচ তাকে গরিলা বলাও চলে না, কারণ তার দেহ খুব বেশি রোমশ নয় এবং তার মুখেও মাখানো রয়েছে প্রায় মানুষের মতো ভাব।

অন্যান্য মূর্তিগুলো তেমনি উদ্ভট। প্রত্যেকটাকে দেখলেই কোনও না কোনও জন্তুর কথা স্মরণ হয়। একটা মূর্তিকে দেখতে তো প্রায় প্রকাণ্ড একটা শূকরের মতোই, তার নাকের তলায় চিবুক ও ওষ্ঠাধরের কোনও চিহ্ন নেই বললেও চলে। অথচ সে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে এবং তার দেহের সাধারণ গঠনের মধ্যে শূকরের চেয়ে মানুষের সাদৃশ্যই বেশি। তাদের দেহের অন্যান্য বিশেষত্বগুলো আধ-অন্ধকারে ভালো করে বোঝা গেল না।

একটা বড় গাছের ডালের ওপর থেকে নেমে এসেছিল কাছির মতো মোটা খুব লম্বা দুটো ঝুরি। গরিলার মতো দেখতে মানুষটা হঠাৎ দুই হাতে সেই দুটো ঝুরি ধরে ফেলে অনায়াসে মাটির ওপর থেকে খানিকটা ওপরে উঠে বারংবার দোল খেতে লাগল মনের

আনন্দে। তারপর সেই ভাবেই শূন্যে দুলতে-দুলতে ভাঙা হেঁড়ে গলায় বললে, আবার জাহাজ এসেছে, আবার প্রভুরা এসেছে, আবার আমাদের শাস্তি পেতে হবে।

নীচে থেকে অন্য মূর্তিগুলো সমস্বরে বলে উঠল, আবার আমাদের শাস্তি পেতে হবে।

কুমার হঠাৎ বিমলের গায়ে একটা ঠেলা মারলে। বিমল সচমকে মুখ ফেরাতেই কুমার ইঙ্গিতে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিলে।

যা দেখা গেল, ভয়াবহ!

খাদের ওপাশে পাহাড়ের ওপরে ছিল নানাজাতীয় গাছের তলায় একটানা ঝোপের সার। একটা ঝোপের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে প্রকাণ্ড ও বীভৎস একখানা মুখ। সেটা যে-কোন জীবের মুখ, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সেই ভয়ংকর মুখের গড়ন খানিকটা সিংহের, খানিকটা ভল্লুকের এবং খানিকটা গভারের মুখের মতো! এই দ্বীপের বাইরে পৃথিবীর দৃষ্টি নিশ্চয়ই কোনওদিন এমন অভাবিত ও অপার্থিব জীবকে দর্শন করবার সুযোগ পায়নি! পণ্ডিতরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম পৃথিবীতে আশ্চর্যরূপে বীভৎস ও বিপুলবপু জীবরা নাকি বিচরণ করত। মাটি খুঁড়ে তাদের অনেকের কঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পণ্ডিতরা সেই সব কঙ্কাল দেখে তাদের চেহারা কতকটা অনুমান করে নিয়েছেন! এই দ্বীপে কি তাদেরই কোনও কোনও বংশধর আজও বিদ্যমান আছে?

জন্তুটার দেহের অন্য কোনও অংশ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার বিস্ফারিত দুই চক্ষুর ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল যেন ক্ষুধিত হিংসার আগুন।

মানিক বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সেই মুখখানার ওপরে গুলিবৃষ্টি করবার উপক্রম করলে।

জয়ন্ত টপ করে তার হাত চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে তিরস্কার করে বললে, ক্ষান্ত হও মানিক, করো কি। বন্দুকের শব্দ শুনে এখানকার সব জীব যদি আমাদের কাছে ছুটে আসে, তাহলে আর কি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব?

হঠাৎ ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল সেই বেয়াড়া মুখখানা।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, জীবটা যে ভয়ানক হিংস্র তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। মাঝখানে এই খাদটা আছে বলেই এতক্ষণ ও আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি। এখন বোধহয় অন্য দিক দিয়ে এদিকে আসবার জন্যে চেষ্টা করবে। এখানে ওরকম আরও কত জীব আছে কে জানে! আপাতত বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, আমারও ওই মত। এই অন্ধকার জঙ্গলের ভেতরে আমরা অত্যন্ত অসহায়। আমরা কারুকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আড়াল থেকে শত্রুরা নিশ্চয়ই আমাদের ওপরে নজর রেখেছে। এখানকার প্রত্যেক ঝোপে-ঝোপেই বিপজ্জনক। আসুন, আবার আমরা বেরিয়ে যাই।

.

০৭.

দ্বীপের অরণ্য থেকে সকলে যখন আবার নিজেদের তাঁবুর ভেতরে ফিরে এল, তখন সর্বাগ্রে তাদের সম্ভাষণ করলেন সুন্দরবাবু। শুধোলেন, জঙ্গলের ভেতরে আরও কতগুলো হনুমান বিছে দেখে এলে?

মানিক বললে, আরে রেখে দিন আপনার হনুমান-বিছে! আমরা যাদের দেখেছি তাদের দেখলেই আপনি হুম বলে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।

বিস্ময়ে দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, বলো কি হে? হনুমান-বিছের চেয়েও ভয়ানক কিছু থাকতে পারে নাকি? উঁহ! একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না!

আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন তবে নিজেই একবার জঙ্গলে গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসুন না!

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, যে জঙ্গলে হনুমান-বিছে পাওয়া যায় সেখানে কোনও ভদ্রলোকেরই যাওয়া উচিত নয়।

আরে বারবার কি হনুমান-বিছের কথা বলছেন? আমরা একটা কি জানোয়ার দেখেছি জানেন? তাও তার সমস্ত দেহটা দেখতে পাইনি, দেখছি কেবল তার মুখখানা! আপনি ছবির নৃসিংহ মূর্তি দেখেছেন তো? এই মূর্তি দেখলে নৃসিংহও ভয়ে পিঠটান না দিয়ে পারবে না।

হুম, তুমি বড় বাজে কথা বলো মানিক! নৃসিংহ হচ্ছে রূপকথার একটা অসম্ভব আর আজগুবি মূর্তি। তারও চেয়ে অপার্থিব কোনও জানোয়ার পৃথিবীতে থাকতে পারে নাকি?

সুন্দরবাবু, কল্পনা করুন এমন একখানা মস্ত বড় মুখ যার খানিকটা দেখতে সিংহের মতো খানিকটা ভালুকের মতো আর খানিকটা গভারের মতো। অর্থাৎ তাকে সিংহও বলা যায় না, ভালুকও বলা যায় না, গভারও বলা যায় না।

সুন্দরবাবু আতঙ্কে এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, তার মুখের ভেতর থেকে একটি টু শব্দও নির্গত হল না।

মানিক বললে, আমরা আরও কী সব আশ্চর্য মূর্তি দেখেছি শুনবেন। গরিলার মতো দেখতে মানুষ, শুয়োরের মতো দেখতে মানুষ, ষাঁড়ের মতো দেখতে মানুষ, বাঘের মতো দেখতে মানুষ, শেয়ালের মতো দেখতে—

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি মানিককে বাধা দিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, থামো বাপু, থামো! তুমি কি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে চাও? তুমি কি আমাকে ডাহা হাঁদা-গঙ্গারাম পেয়েছ? আরে গেল রে!

বিমল বললে, না সুন্দরবাবু, মানিকবাবু সত্য কথাই বলছেন।

তবু সুন্দরবাবু বিশ্বাস করতে চাইলেন না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ জয়ন্ত, আমি বরাবরই দেখে আসছি, তুমি আমাকে কোনও দিনই মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেনি। মানিক যা বলছে তা কি সত্যি?

জয়ন্ত বললে, মানিক একটুও অত্যাচার করেনি। এরকম সব সৃষ্টিছাড়া জীবকে আমরা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছি।

অত্যন্ত দমে গিয়ে সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, জয়ন্ত, এসব দেখবার পরও তোমরা এখনও কি এই দ্বীপের ওপরে থাকতে চাও? আমি কি আগেই তোমাদের সাবধান করে দিইনি যে এটা হচ্ছে ভূতুড়ে দ্বীপ? দেশে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, মাস-দুই পরে পেনশন নিয়ে পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে হাঁপ ছাড়ব মনে করছি, আর তোমরা কিনা আমাকে ধাক্কা দিয়ে অপঘাতে মরবার জন্যে এই ভয়ংকর স্থানে টেনে নিয়ে এলে? তোমাদের মনে কি একটুও দয়ামায়া নেই ভাই? বলতে-বলতে সুন্দরবাবুর মুখখানি কাঁদো কাঁদো হয়ে এল।

বিমল তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে শান্ত কণ্ঠে বললে, ভাববেন না সুন্দরবাবু, আমরা বেঁচে থাকতে আপনার কোনওই অনিষ্ট হবে না।

সুন্দরবাবু আশ্বস্ত হলেন না, মুখ ভার করে বললেন, আপনি ভারী কথাই তো বললেন! আপনারা বেঁচে থাকলে আমার অনিষ্ট হবে না, কিন্তু এই সাংঘাতিক দ্বীপে এসেও আপনারা যে বেঁচে থাকবেন, এমন আশা কেউ করতে পারে কি?

নানা বিপদের মুখে গিয়েও যখন আমরা মরিনি, তখন এই ছোট দ্বীপ থেকে নিশ্চয়ই জ্যান্ত দেহ নিয়ে ফিরে যাব, এমন বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু এখন সেরসব কথা থাক। আপাতত আমাদের দেহও হয়েছে শ্রান্ত আর উদরের ক্ষুধাও হয়েছে অশান্ত, এখন

আমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে রন্ধনশালার রামহরি। চলুন সুন্দরবাবু, সেই দিকেই ধাবমান হওয়া যাক। বৈকালে চায়ের আসরে আপনাকে এই দ্বীপের রহস্য বুঝিয়ে বলব।

সারাদিন সুন্দরবাবু তাঁবুর বাইরে একটিবার মাত্র পা বাড়াননি। বৈকালে বিমলদের চায়ের আসর বসল বাইরে খোলা জমির উপরে। সেখান থেকে বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি বারংবার ডাকবার পরে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসরে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু চা পান করতে করতে এস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত চক্ষে ক্রমাগত দূরের পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু দূরের আলোছায়া-মাখা অরণ্য ও পাহাড়কে দেখাচ্ছিল তখন ছবির মতো সুন্দর। এদিকের ছোট নদীটিও যেন রূপোলি আলোকলতার মতো পড়ে রয়েছে পৃথিবীর শ্যামল শয্যার উপর। চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে পরম শান্তির মধুর ইঙ্গিত, কোথাও কোনও বিভীষিকার এতটুকু আঁচ পর্যন্ত নেই।

চা-পান করতে করতে বিমল বললে, সুন্দরবাবু, অনেকদিন আগে ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে পেনড্রিক নামে এক সাহেব এই দ্বীপে এসে পড়েছিলেন। এখানে এসে তিনি যা দেখেছিলেন সে সমস্তই কাগজে-কলমে লিখে রেখে গেছেন। সেই লেখাটি বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ জি ওয়েলস দি আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো নামে একখানি পুস্তকে প্রকাশ করেছেন।

আমি বরাবরই ওয়েলস সাহেবের রচনার ভক্ত। তাঁর ওই বইখানি পড়েই আমি সর্বপ্রথমে এই দ্বীপের কথা জানতে পারি। ডা. মোরো ছিলেন একজন বিচক্ষণ জীবতত্ত্ববিদ। কেবল তাই নয়, Surg□□□ বা শল্যবিদ্যায় তার হাত ছিল অসাধারণ। অনেক গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হন যে, বিভিন্ন জন্তুর জীবন্ত দেহের ওপরে অস্ত্রোপচার করে তাদের দেহগুলোকে মানুষের দেহের মতো করে তোলা যায়।

সুন্দরবাবু বললেন, বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওই ডা. মোরো ছিলেন দস্তুরমতো উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি। আরে অপারেশন করে গাধাকে যদি মানুষ করে তোলা যেত তা হলে তো ভাবনাই ছিল না!

বিমল বললে, ব্যস্ত হবেন না সুন্দরবাবু, আগে আমার কথা শুনুন। ডা. মোরো কেন যে এরকম অভাবিত সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, ওয়েলস সাহেবের কেতাবখানা পড়ে দেখলে আপনিও তা উপলব্ধি করতে পারবেন। ডা. মোরোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে আমি আর কোনও বাক্যব্যয় করতে চাই না। তবে তিনি যে সত্য-সত্যই গরিলা, বৃষ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়া, ভালুক, শূওর, কুকুর প্রভৃতির দেহের ওপরে অস্ত্রচালনা করে তাদের আকার করে তুলেছিলেন যথাসম্ভব মানুষের মতোই, পেনড্রিক সাহেব স্বচক্ষে তা দেখে লিখে রেখে গিয়েছেন। আর তার কথা যে কাল্পনিক নয়, আমরাও আজ এই দ্বীপে এসে তার যথেষ্ট প্রমাণই পেয়েছি। দ্বীপে আমরা আজ যে সব মনুষ্য রূপধারী জন্তুগুলোকে দেখেছি, সেগুলো হয় ডা. মোরোর স্বহস্তের কীর্তি, নয় তারা হচ্ছে তারই সৃষ্ট জীবদের বংশধর। তাদের দেহই কেবল মানুষের মতো দেখতে নয়, তারা কথাও কয় মানুষের ভাষায় ইংরেজিতে।

সুন্দরবাবু বললেন, নাঃ, ডা. মোরো পাগল না হলেও শেষটা আমাদেরই দেখছি পাগল হতে হবে। আপনি কি বলতে চান বিমলবাবু, অস্ত্রোপচার করে জন্তুকেও শেখানো যায় মানুষের ভাষা?

বিমল বললে, না, আমি সেকথা বলতে চাই না। ডা. মোরো নিজেই পেনড্রিক সাহেবকে বলেছিলেন, এইসব জন্তুকে মানুষের আকার দিয়ে মানুষের ভাষা শিখিয়েছিলেন তিনি নিজেই। কেবল মানুষের ভাষা নয়, তিনি তাদের মানুষের আচার-ব্যবহারও শেখাতে ভোলেননি। ওয়েলস সাহেবের কেতাবে এমন ইঙ্গিতও আছে, ডা. মোরো হিপনোটিজম বা সন্মোহন বিদ্যাও জানতেন। খুব সম্ভব সেই সন্মোহন-বিদ্যার প্রভাবই ওই মানুষ জন্তুগুলোর ওপরে কাজ করেছিল সবচেয়ে বেশি। মানুষ জন্তুগুলো ডা. মোরোকে ভয় করত যমের মতো, তাকে তারা প্রভু বলে মনে করত। ডা. মোরো তাদের বুঝিয়েছিলেন-

তোমরা হচ্ছ মানুষ; তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো চলাফেরা করো না; তোমরা কখনও মৎস্য মাংস ভক্ষণ করো না; মানুষ দেখলে তোমরা তাদের পেছনে তাড়া করে যেও না প্রভৃতি। এইসব নীতি বাক্য তিনি তাদের সর্বক্ষণ মুখস্থ করতে বলতেন। আজ আমরাও তাদের মুখস্থ করা নীতিবাক্য কতক কতক শুনে এসেছি।

সুন্দরবাবুর বিস্ময় এমন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল যে মুখব্যাদান করে তিনি নির্বাক ভাবে বসে রইলেন মূর্তির মতো।

বিমল বললে, কিন্তু ডা. মোরো খোদার ওপরে খোদাকারি করতে গিয়েছিলেন, তাই পরে প্রকৃতি নিতে চেয়েছে প্রতিশোধ। ওইসব গরিলা-মানুষ, বাঘ-মানুষ আর অন্যান্য জন্তু মানুষ দেখতে মানুষের মতো হলেও মানুষের প্রকৃতি তাদের ওপরে সমানভাবে কাজ করতে পারলে না। তাদের ভেতরে ক্রমেই বেশি করে আবার ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠতে লাগল জানোয়ারের প্রকৃতি। তারপর জন্তু-মানুষদের যেসব সন্তান হল, তাদের দেহও হয়ে উঠল অনেকটা জন্তুর মতো দেখতেই। শিশু-বয়সেই তারা বাপ-মায়ের কাছ থেকে মানুষের ভাষা ও নীতি শিক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু তাদের কাছে প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ জন্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব। আজ তাদের মাংস খেতে আপত্তি নেই। মানুষ দেখলে হিংস্র জন্তুর মতোই তাড়া করবে আর মাঝে মাঝে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেও এখন তারা বিচরণ করবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো। তাদের বংশধররা হয়তো জন্মাবধি অবিকল জন্তুর দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে, হয়তো মানুষের ভাষায় কথা কইবার শক্তি পর্যন্তও তাদের থাকবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, ধরলুম, এই দ্বীপে বাস করে কতকগুলো আজব জন্তু-মানুষ; কিন্তু আমি যে হনুমান-বিচ্ছেটাকে দেখেছি, তার সঙ্গে তো কোনও মানুষের কি কোনও বিশেষ জন্তুর চেহারার কিছুই মেলে না! সেটা এই দ্বীপে এল কেমন করে? তারপর ধরুন, আপনারা আজ যে কিন্ডুতকিমাকার সিংহ-ভল্লুক-গভারটাকে দেখেছেন, তাকেও তো তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারি না!

বিমল বললে, পেনড্রিক সাহেবের কাছে ডা. মোরো বলেছিলেন, জন্তু-মানুষের পর জন্তু মানুষ গড়তে-গড়তে তার যখন একঘেয়ে লাগত, তখন তিনি বৈচিত্র্যের জন্যে একাধিক জন্তুর চেহারা মিলিয়ে মাঝে-মাঝে সৃষ্টিছাড়া সব জানোয়ার তৈরি করতেন। ওই হুন্মান-বিছে প্রভৃতি সেইসব জানোয়ারেরই নমুনা।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! আপনার ওই পেনড্রিক সাহেব আর ডা. মোরো জাহান্নমে গেলেও আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু উপস্থিত নিজেদের কথাও ভেবে দেখতে হবে তো? ওই নরদেহধারী জন্তুগুলো আর জন্তুদেহধারী উলঙ্গ বিভীষিকাগুলো যদি আমাদের আক্রমণ করে?

এর মধ্যে যদি-টদির কিছু নেই, ওরা আমাদের আক্রমণ করবেই।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, বলেন কি মশাই!

হ্যাঁ। খুব সম্ভব ওরা আজ রাতেই আমাদের আক্রমণ করবে।

কী করে জানলেন আপনি?

ওরা আমাদের দেখেছে। ওদের মধ্যে যারা বেশি হিংস্র তারা নিশ্চয়ই আজ রাতে শান্তভাবে চুপ করে বাসায় বসে থাকবে না।

কিন্তু আপনি কেবল রাত্রের কথাই তুলছেন কেন? আমাদের আক্রমণ করবার ইচ্ছে থাকলে ওরা দিনের বেলাতেও আসতে পারে তো?

আপনি কি হিংস্র জন্তুদের স্বভাব জানেন না? দিনেরবেলায় তাদের হিংস্র মন আধ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। দিনের আলো নেববার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা জাগ্রত হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। রাত্রি যত বাড়ে তাদের হিংস্র ভাবও তত বেশি হয়ে উঠে। সেই সময় তারা বেরিয়ে পড়ে দলে দলে জীব-শিকারে। আমার অনুমান সত্যি কিনা আজ রাতেই পাওয়া যাবে তার প্রমাণ।

সুন্দরবাবু ভয়াত স্বরে বললেন, মাপ করবেন মশাই, আমি প্রমাণ-ট্রমাণ কিছুই পেতে চাইনে। এই মুহূর্তেই আমি জাহাজে গিয়ে উঠতে চাই।

বিমল সেকথা কানে না তুলে বললে, এই দ্বীপের সব জীবই যে হিংস্র আর হত্যাকারী, আমি সেকথা মনে করি না। আমরা আজ স্বকর্ণে শুনেছি, কতকগুলো জীব এখনও নিজেদের মানুষ বলে গর্ব করে আর মনুষ্য ধর্ম পালন করবার জন্যে নীতি-বাক্যও মুখস্থ করে থাকে। এও শুনে এসেছি, এখানে আমাদের আবির্ভাবে তারা ভয় পেয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মতো আসল মানুষকে তারা মনে করে প্রভুর মতোই। খুব সম্ভব তারা আমাদের আক্রমণকারীদের দলে যোগ দিতে রাজি হবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, যে জীবগুলো তাদের মতো বৈষ্ণব নয় আপনি সেই হতভাগাদের কথা ভাবছেন না কেন? হনুমান-বিছে আর ওই ওর নাম কি সিংহ-ভল্লুক-গন্ডারের দল যদি আমাদের এখানে এসে হানা দেয়?

বিমল হাসতে হাসতে বললে, আমরা যে সঙ্গে এতগুলো সেপাই, মেশিন-গান আর বন্দুক-রিভলভার এনেছি, সে সব কি খালি লোক দেখাবার জন্যে? কুমার, আর খানিক পরেই সন্ধ্যা নামবে। তুমি এখন থেকেই সেপাইদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে এসো। সকলেই যেন এক একটা ঝোপঝাঁপ বেছে নিয়ে ওই বন আর নদীর দিকে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। মেশিন-গানগুলো বাইরে যথাস্থানে এনে রাখবার ব্যবস্থা করো। আজকে আমরা রাত্রি যাপন করব কবির মতো চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুক্ত আকাশের তলায়। তফাত খালি এই, কবিরা ব্যবহার করেন মসী, আর আমরা হব অসির ভক্ত।

কিন্তু এই অসাময়িক কবিত্বের জন্যে সুন্দরবাবুর গা যেন জ্বলে গেল। একে তো যুদ্ধের আয়োজনের কথা শুনেই তার বুকের ভেতরে জেগেছে টিপটিপ শব্দ, তার ওপরে আবার এই কবিত্বের অত্যাচার! এতটা তার আর সহ্য হল না, তিনি তাড়াতাড়ি দোদুল্যমান ভুঁড়ি নিয়ে ছুটলেন সকলের নামে নালিশ করতে রামহরির কাছে।

০৮.

সুন্দরবাবুকে উদর-পিশাচ উপাধি দিয়ে মানিক যখন-তখন জ্বালাতন করত; কিন্তু এই দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর সেই সুবিখ্যাত জঁঠরাগ্নি ঘুমিয়ে পড়েছিল যেন একেবারেই! তখন ওপরে আজ আবার কতকগুলো দানব বা রাক্ষসের মতো জীবের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হতে পারে এই সম্ভাবনাটা তাঁকে এতটা কাহিল করে ফেললে যে, মুখবিবরে তিনি একখণ্ড খাদ্যও নিষ্ক্ষেপ করতে পারলেন না।

অভুক্ত অবস্থাতেই কেবল এক পেয়ালা কফি পান করেই বিমলদের সঙ্গে তিনি গাত্রোত্থান করলেন। তাঁবুর বাইরে পদার্পণ করবার ইচ্ছা তার একটুও ছিল না। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সকলের পেছনে পেছনে তিনি সুড়সুড় করে এগুতে লাগলেন ঠিক যেন বলির পাঁঠার মতো।

বিমল ভুল বলেনি, সত্যিই সেদিনকার রাত্রিটি ছিল কবিত্বময়। দূরে মহাসাগরের তৈরব রাগের সঙ্গে কাছের নটিনী তটিনী জলবীণার তারে তারে বাজছিল অতি মৃদু একটি রাগিণীর গুঞ্জন। আকাশের তারা-সভায় জেগে ছিল সভাপতি চাঁদ। তালজাতীয় গাছগুলি দুলে দুলে উঠছিল বাতাসের তালে-তালে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথার পাতায়-পাতায় জ্যোত্স্না পরিয়ে দিচ্ছিল ঝকমকে বিজলি-হার। আরও দূরে স্তব্ধ পাহাড় ও নিখর বনভূমিকে দেখাচ্ছিল স্বপ্ন-জগতের পরিপূরীর মতো।

কিন্তু এই শান্তি-সুখমা সুন্দরবাবুকে অভিভূত করতে পারলে না। তার মতে, ঝড়ের আগে প্রকৃতিও এমনি শান্ত ভাব ধারণ করে। যে-কোনও মুহূর্তে এখানে কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধবার সম্ভাবনা, তাই ভেবে ভেবেই তিনি হয়ে পড়লেন যারপরনাই কাতর! কিন্তু সেই কাতরতার ভেতরেও তিনি পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করবার সঠিক উপায় খোঁজবার জন্যে এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে ভুললেন না।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল পরস্পরের দিকে হেলে পড়ে তিনটি তাল-জাতীয় গাছ। তারই তলায় রয়েছে একটি নাতিবৃহৎ ঝোপ এবং ঝোপের ভেতর থেকে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে মস্ত একখানা পাথর। সুন্দরবাবু বুঝলেন ও জায়গাটা তাঁর পক্ষে হবে অনেকটা নিরাপদ।

বিমলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, বিমলবাবু, ওই তিনটে গাছের তলায় বসে আমি যদি পাহারা দি, তাহলে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?

বিমল জায়গাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবুর মনোভাব বুঝে মুখ টিপে হেসে বললেন, আপত্তি? কিছুমাত্র না।

মানিক বললে, কিন্তু সুন্দরবাবু, একটু হুঁশিয়ার হয়ে ওখানে যাবেন।

সুন্দরবাবু অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু মানিকের কথা শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে যাব! কেন বলো দেখি?

কে বলতে পারে ওই ঝোপের তলায় আপনার হনুমান-বিছের মতো কোনও বিদকুটে জন্তু-টন্তু লুকিয়ে নেই?

সুন্দরবাবু মানিকের কথা নিতান্ত অসংগত মনে করতে পারলেন না। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে ঝোপটার দিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তের দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ ভাই জয়ন্ত, তুমি একবার আমার সঙ্গে ওই ঝোপ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে?

কেন সুন্দরবাবু?

ভায়া হে, একজোড়া চোখের চেয়ে দু-জোড়া চোখের দাম বেশি। দুজনে মিলে ঝোপটা একবার পরীক্ষা করে দেখব, ওখানে যাচ্ছেতাই কিছু ঘুপটি মেরে আছে কিনা!

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হয়ে সেই ঝোপ পর্যন্ত গেল। না, সেখানে। সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কৃত হল না। সুন্দরবাবু তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চার হাতে পায়ে গুঁড়ি মেরে ঝোপের ভেতরে ঢুকে বললেন, হুম! কপালে আজ কি লেখা আছে কে, জানে?

রাত্রির মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছিল অশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জল-কল্লোল। আকাশ সায়েরে সাঁতার কেটে চাঁদ এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। চারদিকে পুলক ছড়িয়ে দিয়েছে স্বচ্ছ আলোক। এখানে-ওখানে ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা খেলছে জ্যোৎস্না। মাঝে-মাঝে ছোট নদীর ক্ষীণ রেখাটি দেখা যাচ্ছে গলাননা হিরার মতো।

কেটে গেল প্রথম রাত্রি।

প্রকৃতির ভেতরে আলোকোৎসব হচ্ছে বটে, কিন্তু জ্যোৎস্নাকেও হার মানিয়ে দেয় এমন একটা সুতীর ও সুদীর্ঘ আলোক আজ এখানে ঘোরাফেরা করছে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সেটা হচ্ছে জাহাজের শক্তিশালী সার্চলাইট। অন্ধকারকে নির্বাসিত করবার জন্যে কুমারই আজ আলোর ব্যবস্থা করে এসেছে।

আচম্বিতে এই চলন্ত আলোক-রেখাটা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সকলে সচকিত দৃষ্টিতে দেখলে, একটা ঢালু পাহাড়ে-জমির ওপরে আবির্ভূত হল অনেকগুলি মূর্তি। দল বেঁধে তারা নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল।

চোখে দূরবিন লাগিয়ে বিমল বললে, ওদের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে; কিন্তু ওরা হাঁটছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো!

জয়ন্ত বললে, ওরা আসছে আমাদেরই দিকে।

বিমল বললে, হুঁ, তা আসবেই তো। রাত্রি হয়েছে গভীর, জেগেছে ওদের নকল মানুষ-দেহের মধ্যে বুভুক্ষু পশু-আত্মা! জয়ন্তবাবু, ডা. মোরোর থিয়োরির ভেতর, গোড়াতেই

ছিল গলদ। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কোনও পশুর বাইরেকার আকার বদলালেই তার ভেতরকার স্বভাব বদলায় না। পশুরা হচ্ছে-

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

সার্চলাইটের সীমার মধ্যে এসে দাঁড়াল আরও একদল মূর্তি। তারা দেখতেই কেবল। মানুষের মতো নয়, হাঁটছেও মানুষের মতো দুই পায়ে।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট, কিন্তু গম্ভীর স্বর বললে, চার পায়ে চলব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, আমরা মানুষ!

গম্ভীর কণ্ঠ আবার বললে, মাছ-মাংস খাব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বলে, আমরা মানুষ!

গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললে, মানুষদের দেখলে তাড়া করব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, আমরা মানুষ!

বিমল বললে, শুনছেন জয়ন্তবাবু? এই দ্বীপের সব নরপশু এখনও ডা. মোরোর শিক্ষা ভোলেনি? এর একটা কারণও অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব, যারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় তারা হচ্ছে, ডা. মোরোর দ্বারা সৃষ্ট নরপশুদের বংশধর। তারা ডা. মোরোকে দেখেওনি, তাই তাঁর সম্মোহন-শক্তি তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

সুন্দরবাবুও নিজের ঝোপে বসে সব দেখছিলেন এবং শুনছিলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে উঠছিলেন চমকে-চমকে! মাঝে-মাঝে এটাও ভাবছিলেন যে, এমন ভয়ানক জায়গায় এইভাবে একলা একটা ঝোপের ভেতরে বসে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়! বিমলদের

সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। বিখ্যাত প্রবাদ-বচনটি একটু বদলে নিয়ে মনে মনে তিনি বলছিলেন-দশে মিলি করি কাজ, হারি-মরি নাই লাজ। শেষটায় সত্যসত্যই তিনি যখন নিজের ঝোপটি ত্যাগ করে বহির্গত হবার উপক্রম করছেন, তখন ঘটে গেল একটা অকল্পিত এবং ভয়ংকর ঘটনা।

হঠাৎ একদিক থেকে আকাশ-ফাটানো চিৎকার জাগল-ওরে বাবা রে, ভূতে ধরলে রে।

সুন্দরবাবু ভূতকে মানতেন অত্যন্ত বেশিরকম। ভূতের নাম শ্রবণ করলেই তার সর্বাঙ্গ হয়ে উঠত রোমাঞ্চিত-বিশেষত রাত্রিবেলায়। তদুপরি তিনি এখন যেখানে অবস্থান করছেন, তার মতে সেটা হচ্ছে দস্তুরমতো ভূতুড়ে দ্বীপ! সুতরাং সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না! এবং সঙ্গে-সঙ্গে অতিশয় স্তম্ভিত চক্ষে যে অসম্ভব দৃশ্য অবলোকন করলেন তা হচ্ছে এই

রামহরি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে এবং তার পেছনে-পেছনে তাড়া করে আসছে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো সেই বিভীষণ জীবটা? উঃ, সুন্দরবাবু প্রায় মূর্ছিত হয়ে ধরাশায়ী হন আর কি!

দেখা যাচ্ছে হাতির মতো প্রকাণ্ড একখানা আশ্চর্য মুখ! হাতির মতো প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু সেটা মোটেই হাতির মুখ নয়! সে যেন খানিক সিংহ, খানিক ভল্লুক, খানিক গভারের মুখ নিয়ে ভেঙে-চুরে অথচ মিলিয়ে মিশিয়ে গড়া! তার দুটি ক্ষুধিত চক্ষে দপদপ করে জ্বলছে দারুণ হিংসার অগ্নি!

সুন্দরবাবু প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন, হুম, হুম, হুম।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল বাঘাকে, এবং শোনা গেল তার ক্রুদ্ধ চিৎকার! মস্ত একটা লাফ মেরে বাঘা সেই মুখখানার পেছনে এসে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সে কী কান ফাটানো প্রাণ-দমানো তর্জন-গর্জন এবং কী ঝটাপটি, লাফালাফি ও হানাহানি!

সুবারু আর পারলেন না, দুই নেত্রে সরষেফুল দেখে বাবা রে বলে চৈঁচিয়ে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটির উপরে।

অন্যান্য সকলেই সেই দৃশ্য দেখেছিল। বিমল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, কুমার, আমার সঙ্গে এসো। জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! আপনারা এইখানেই বসে ওইদিকে দৃষ্টি রাখুন।

বিমল ও কুমার বেগে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখলে, সেই কিন্তুতকিমাকার, সিংহ ভল্লুক গভারের মতো দেখতে মস্ত মুখখানার পেছনে কণ্ঠদেশ কামড়ে রয়েছে বাঘা! সেই অদ্ভুত জন্তুটা বাঘার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে বাঘাকে নিয়েই বারংবার মাটির ওপর থেকে লাফ মেরে শূন্যে উঠে আবার মাটির ওপরে এসে পড়ে ছটফট করছে এবং গড়াগড়ি দিচ্ছে; কিন্তু বাঘা যেন ছিনে জোঁক দাঁতের কামড় একটুও আলগা করতে রাজি নয়।

গুডুম! গুডুম! গর্জে উঠল বিমল ও কুমারের বন্দুক।

সিংহ-ভল্লুক-গভারের মুখ আর একবার বাঘাকে নিয়ে শূন্যে লক্ষ্যত্যাগ করে আবার ধরাশায়ী হয়ে দুই-একবার ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

কুমার বন্দুকের অগ্রভাগ দিয়ে সেই জীবটার দেহকে পরীক্ষা করে বললে, আয় রে আমার বাঘাআয় রে আমার মহাবীর! ওটা একেবারে পাথরের মতো মরে গিয়েছে, সাজ হয়েছে ওর লীলাখেলা!

বিমল বিস্ফাতির নেত্রে বললে, ভাই কুমার! ডা. মোরোর বিচিত্র খেয়াল এ কী জন্তু সৃষ্টি করেছে! দেখো, এত বড় হাতির মতো মুখ, কিন্তু এই মুখের তলায় রয়েছে মাত্র হাত দেড়েক লম্বা আর হাত খানেক চওড়া একটা থলের মতো দেহ! আর সেই দেহের তলায়। রয়েছে কুমিরের পায়ের মতো চারখানা ছোট ছোট পা! এ যেন পর্বতের মুষিক প্রসব!

ঠিক সেই সময়ে ওদিক থেকে জয়ন্ত চিৎকার করে বললে, বিমলবাবু! কুমারবাবু!

বিমল ও কুমার আবার দ্রুতবেগে হাজির হল গিয়ে যথাস্থানে।

জয়ন্ত বললে, বিমলবাবু, ওদিকে তাকিয়ে দেখুন, চারপায়ে হাঁটা জীবগুলোর সঙ্গে দুইপায়ে হাঁটা জীবগুলোর লড়াই বেধে গিয়েছে!

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে বললে, তাই তো দেখছি। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের মানুষ বলে গর্ব করে, নিশ্চয়ই তারা হিংসুক জীবগুলোকে বাধা দিতে চায়।

মানিক বললে, অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা! এই অজানা দ্বীপেও আছে আমাদের না-জানা বন্ধু।

কুমার বললে, বিমল, অন্য-অন্য জীবরা মারামারি নিয়ে ব্যস্ত বটে, কিন্তু সেই ফাঁকে তিনটে মূর্তি চুপি চুপি আমাদের দিকে আসছে দেখতে পাচ্ছ?

বিমল আবার দূরবিনের সাহায্য গ্রহণ করে বললে, কুমার, কুমার! দুটো মূর্তির গায়ের রং, চিতাবাঘের মতো! চাটগাঁয়ে গিয়ে তুমি এমনি মূর্তিই দেখেছিলে না?

নরপশু তিনটে ঝোপঝাপ ও গাছপালার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করতে-করতে অনেকটা এগিয়ে এল।

বিমল বললে, ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া নয়। ছোড়ো সবাই বন্দুক। এক, দুই, তিন।

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল। একটা মূর্তি লাফ মেরে উঠেই মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর-একটা মূর্তি ধরাশায়ী হয়ে আর একটুও নড়ল না। তৃতীয় মূর্তিটা বেগে পলায়ন করলে।

বন্দুকের ভীষণ গর্জন শুনেই নরপশুরা মারামারি থামিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিতের মতো। তার পরেই কতকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, আবার আমাদের প্রভুরা এসেছেন! এইবারে আমাদের শাস্তি পেতে হবে!

অতঃপর সুন্দরবাবুর অবস্থাটা দেখা দরকার।

সিংহ-ভল্লুক-গভারের গর্জন শ্রবণ করে সুন্দরবাবু অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, এখন তার মূর্ছা ভেঙে গেল বন্দুকের শব্দে। তিনি বলে উঠলেন, হুম! ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হচ্ছে। যে! তাহলে তুমুল লড়াই শুরু করে গেছে? কিন্তু এখানে যে দুটো ভূতুড়ে জানোয়ারের নমুনা দেখেছি বাবা, তাদের সঙ্গে লড়াই করে কখনও পেরে ওঠা যায়? যাদের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে যায় চমকে, তাদের সঙ্গে লড়াই কেমন করে? এখান থেকে লম্বা দেওয়ারও কোনও উপায় নেই, মহাসমুদ্রের মাঝখানে পুঁচকে একটা দ্বীপ, তারই মধ্যে হয়েছি বন্দি! ঝোপের বাইরেও পা বাড়াতে ভরসা হয় না, কে জানে বাবা কোথায় ঘুপটি মেরে বসে আছে বদমেজাজি কিন্তুতকিমাকারের দল! হুম কী যে করি! ওরে বাপ রে! এ আবার কী?

বিপুল বিস্ময়ে এবং বিষম আতঙ্কে সুন্দরবাবুর বিস্ফারিত চক্ষু দুটো গোল হয়ে উঠল চাকতির মতো।

থরথর করে কাঁপতে লাগল পায়ের তলাকার মাটি, তার পরেই শোনা গেল যেন অসম্ভবরূপে বিরাট এক মহাদানবের বিশ্ব-ফাটানো ভৈরব হুংকারের পর হুংকার! তার পরেই দেখা গেল, পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে পুঞ্জীভূত ধূম্রাশি এবং থেকে-থেকে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে মেঘচুম্বী প্রচণ্ড অগ্নিশিখা।

দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল বহু জীবের ভীত কণ্ঠস্বরের একটানা আর্তনাদ। এও দেখা গেল, অনেক তফাতে দলে দলে জীব কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ছুটোছুটি করছে দিকে দিকে, কিন্তু সেগুলো মানুষ কি জানোয়ার কিছুই বোঝা যায় না।

দুই হাত দিয়ে চেপে বুকের কাপুনি থামাবার চেষ্টা করে সুন্দরবাবু মনে-মনেই বললেন, এ আবার কি কাণ্ড বাবা? পৃথিবীর প্রলয়কাল এল নাকি?

ঝোপের বাইরে অনেকগুলো দ্রুত পায়েৰ শব্দ শুনে সুন্দরবাবুর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল।
তিনি আবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে যান!

তারপরে শোনা গেল বিমল চিৎকার করে বলছে, আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছে! পাহাড়ের
ওপর থেকে নেমে আসছে তপ্ত লাভার স্রোত! দ্বীপের সমস্ত প্রাণী মারা যাবে। নৌকো
ভাসাও, নৌকো ভাসাওজাহাজে চলো!

মানিকের গলায় শোনা গেল-জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবু কোথায় গেলেন? সুন্দরবাবু?

এই যে আমি, এই যে আমি বলতে-বলতে সুন্দরবাবু হাঁসফাস করতে করতে ঝোপের
ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মানিক তাঁর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বললে, আর নয়, এই অভিশপ্ত দ্বীপে আর নয়! প্রাণে
বাঁচতে চান তো প্রাণপণে দৌড়ে চলুন!

জাহাজ ছুটছে। তার আর দ্বীপের মাঝখানে এখন অনেকখানি ব্যবধান।

কিন্তু দ্বীপের দিকে তাকালে এখন কেবল দেখা যায় বিপুল ধূম্রপুঞ্জের সঙ্গে বিরাট
অগ্নিকাণ্ড। আগুনের শিখায় লালচে হয়ে উঠছে ওখানকার আকাশ পর্যন্ত।

বিমল দুঃখিতভাবে বললে, বিদায় ডা. মোরোর দ্বীপ! মনে এই আক্ষেপ রয়ে গেল তোমার
সমস্ত রহস্য জানা গেল না।

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, আবার আপনি রহস্যের নাম মুখে আনছেন? রহস্য!
যতদিন বাঁচব আর কখনও কোনও রহস্যেরই ধার মাড়াব না-হুম!